আত্মা, যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। সেই আত্মার নিকট অজ্ঞাত কিছুই নাই, কারণ সেই আত্মা স্বয়ংই পরম সদ্‌বস্তু ব্রহ্ম, অয়মাত্মা. ব্রহ্ম—ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জানেন। অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা আমরা যখন আমাদের মূল সত্তায় এই ব্রহ্মের সহিত এক হই—তখন আমাদের সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে সকল জ্ঞান, সকল সত্য প্রতিভাত হয়, ঋষিগণ এইরূপ সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে সত্যকে দর্শন করিয়াছিলেন, এবং জ্যোতির্ম্ময় শক্তিময় ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা সত্যদ্রষ্টা, মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া কথিত হন—শ্রুতি হইতেছে সেই সব মন্ত্রের গ্রন্থ, তাই ভারতে তাহাদেব এত সমাদর। শুধু পুঁথিতে লেখা আছে বলিয়াই ভারতীয়গণ তাগাদের সমাদব কবে না, সাধনার দ্বারা সকলেই নিজ নিজ হৃদয়ে সাক্ষাৎভাবে সে-সব সত্য দর্শন কবিতে পারেন ; সেগুলি কেবল অন্ধ বিশ্বাসের বিষয় নহে। চক্ষু কর্ণ দিয়া আমরা যে-সব বস্তু প্রত্যক্ষ করি সেগুলি যেমন সত্য বলিয়া মনে হয়, অধ্যাত্ম অনুভূতিতে আমরা যে তথ্য প্রত্যক্ষ করি তাহা তদপেক্ষা কম সত্য বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয়গণ অন্ধভাবে শাস্ত্রবিশ্বাস করিতে বলে নাই, নিজেদের হৃদয়ের আলোকে সব শাস্ত্র যাচাই করিয়া লইতে বলিয়াছে। গীতা বলিয়াছে, জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে, যাহারা যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছে তাহারা শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদকেও অতিক্রম করিয়া যায়। যুক্তিতর্কের কসরতের দ্বারা নহে, পরন্তু সাধনাব দ্বারা, সত্য পথের অনুসরণের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া সাক্ষাৎ-ভাবে উপলব্ধি করা যায় এ কথা উপনিষদে বার বার বলা হইয়াছে,

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥
—মুণ্ডকোপনিষদ—৩।১।৫

"এই আত্মাকে সত্য ও তপস্যার দ্বারা লাভ করিতে হয়, পূর্ণজ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে হয় ; কারণ তিনি এই শরীরের মধ্যেই রহিয়াছেন, তিনি উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়, যত্নশীল সাধকগণ মানবীয় কলুষ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন।"

শঙ্কর, রামানুজ, ভারতের সকল দার্শনিকই নিজ নিজ অধ্যাত্ম সাধনা ও অনুভূতির উপরেই নির্ভর করিয়াছেন, যুক্তিতর্কের উপর নহে—তবে তাঁহাদের ঐ অনুভূতি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহারা যুক্তিতর্কের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং

সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস উদ্রেক করাইবার জন্য এবং নিজেদের অনুভূতিরও সমর্থনের জন্য তাঁহারা শ্রুতির দোহাই দিয়াছেন—কারণ শ্রুতি হইতেছে প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বাক্য,

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ।

বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনের মধ্যে, শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকের মধ্যে যে পার্থক্য ও মতভেদ দেখা যায়, তাহার কারণ তাহারা পূর্ণ সত্যের এক একটি দিকের উপরেই সমধিক জোর দিয়াছেন, কারণ তাহাদের অনুভূতিতে সেই দিকটাই সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব পার্থক্য ও মতভেদের সমন্বয় যুক্তিতর্কের দ্বারা হয় না, গভীরতর পূর্ণতর অধ্যাত্ম উপলব্ধির দ্বারা সত্যকে সমগ্রভাবে দর্শন করিয়াই এই সব বিরোধের সমন্বয় ও সমাধান হইতে পারে।

ভারতের দার্শনিকগণ অধ্যাত্ম অনুভূতিতে সত্যের যতটুকু দর্শন করিয়াছেন তাহারই উপর তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা মানসিক বুদ্ধিবিচারকে কাজে লাগাইয়াছেন তাঁহাদের অধ্যাত্ম অনুভূতিকে সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য। আর পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বিচারবুদ্ধির দ্বারাই সত্যকে জানিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা আত্মার আলোকে সত্যকে সাক্ষাৎভাবে না দেখিয়া মনবুদ্ধির মধ্যে সেই সত্যের যে ছায়া পতিত হইয়াছে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারাও সত্যের আভাস কিছু পাইয়াছেন সন্দেহ নাই, ছায়া দেখিয়াও মূলবস্তুর স্বরূপ কতকটা বুঝা যায়, কিন্তু তাহা অতি ক্ষীণ, অপূর্ণ এবং অনেক সময়েই বিকৃত পরিচয়। তাই দেখা যায় পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ খুবই সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিলেও তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ মানুষের অধ্যাত্ম জীবন গঠনে বিশেষ সহায় হয় নাই, পাশ্চাত্য জাতি দর্শন শাস্ত্রকে চিন্তাবিলাসীর স্বপ্ন বলিয়া জীবন হইতে বাদ দিয়াছে। অন্যপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা, ভারতীয় জীবন মূলতঃ ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং এই ভাবেই ভারতবাসীর মন প্রাণ অধ্যাত্ম জীবন লাভের জন্য যেমন প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে এমনটি জগতে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে বুদ্ধির সাহায্যে পরম তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহা সাধারণ বুদ্ধি নহে, তাহা একটা উচ্চতর শক্তি। বুদ্ধির যে নানা স্তর আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্ঞানী অজ্ঞানী, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধু অসাধু সকলেরই বুদ্ধি আছে, সকলেই বিচার করে, তর্ক করে—কিন্তু সকলের বুদ্ধি সমান নহে। বুদ্ধি বিচারে সাধারণ লোক কত ভুল করে,

তর্ক শাস্ত্র (Logic) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা দেখাইয়া দেয়। বুদ্ধিবিচারে যাহাতে এইসব ভুল না হয় সেজন্য বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন, তাই সাধারণ মানুষের জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানে এত তফাৎ হয়, এবং এই জন্যই বিজ্ঞান সমর্থ বুদ্ধির সাহায্যে প্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে এত তথ্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কেমন করিয়া যথাযথ ভাবে বুদ্ধি চালনা করিতে হয় তাহা শিখিতে হয়, অভ্যাস করিতে হয়—এ-বিষয়ে দক্ষতা অর্জ্জন না করিয়া যাহারা তর্কযুক্তি খাটাইতে যায় তাহারা পদে পদে ভুল করে, শুভকে অশুভ বলিয়া অশুভকে শুভ বলিয়া গ্রহণ করে, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, এইভাবে মানুষের জীবন বিপর্য্যস্ত। আমাদের দেশে এককালে এই শিক্ষাদীক্ষা খুবই উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল—কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে ভারতের যে খুবই অবনতি হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যপক্ষে বিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে পাশ্চাত্য দেশ তর্কশক্তির বিকাশে অমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক অগ্রসর হইয়াছে, তাই ভারত এখন জীবন সংগ্রামের তীব্র প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য জাতির নিকট পরাজিত হইতেছে। এ-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "আমার এ ধারণা হয় যে, ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধ বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তা-শক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিকাশ। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, অন্বেষণ করে, পরিশ্রম করে বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে।··· য়ুরোপে দেখ—দেখবে দুটি জিনিষ—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে, সেই শক্তির বলে জগৎকে সে গ্রাস করতে পেরেছে, আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত—যাঁদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত।···তারপর ভারত দেখ—কয়েকজন solitary giant (বড় লোক), আর সর্ব্বত্র সোজা মানুষ অর্থাৎ average man—যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার কিছুমাত্র শক্তি নাই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারত চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা, য়ুরোপ চায় গভীর চিন্তা গভীর কথা।"

জ্ঞানের জন্মভূমি ভারতবর্ষে এই চিন্তাশক্তির হ্রাস, এইরূপ অজ্ঞান-অশক্তির বিকাশ কেমন করিয়া হইল, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। কেহ কেহ বলেন আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতার দিকে অত্যধিক ঝোঁকের ফলেই ভারতের এই অবনতি। কিন্তু চিরকালই ভারতের ঐ দিকে ঝোঁক, ভারতীয় সভ্যতার ইহাই বৈশিষ্ট্য, তাহা সত্ত্বেও ভারত পুরাকালে অপূর্ব্ব চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির বিকাশ করিয়াছিল—অতএব এ

ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কেহ বলেন, ভারতবাসী সর্ব্বদা শ্রুতির দোহাই দিয়াছে, বুদ্ধি বিচারের দ্বারা সত্যের সন্ধান করে নাই, সেইজন্যই তাহাদের চিন্তাশক্তির হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু পুরাকালেও ত ভারতের এই অভ্যাস ছিল, যোগী ঋষির কথা তাহারা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছে, বেদ উপনিষদের সত্যকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে—তথাপি তাহারা চিন্তাশক্তি হারায় নাই। চিন্তাশক্তির যথার্থ কার্য্য কি, উপযোগিতা কি, প্রাচীন ভারতীয়েরা তাহা স্পষ্টভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, বাহ্য জগতের ব্যবহারিক জ্ঞান চিন্তাশক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়। বাহ্য জগতের জ্ঞান অর্জ্জনে তাঁহারা মন বুদ্ধি দ্বারা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, তর্ক, অনুমানকে অগ্রাহ্য করেন নাই, এ-সবেরও যথাসম্ভব পূর্ণতা সাধন করিয়াছিলেন, এবং এইভাবে জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানেও তাঁহারা যেরূপ উচ্চে উঠিয়াছিলেন, তৎকালীন জগতের অন্য কোন জাতির কৃতিত্বের তুলনায় তাহা হীন ছিল না। গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জৈববিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে তাঁহারা বহু তথ্যের আবিষ্কার করিয়া মানবীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান এই প্রণালীতে লাভ করা যায় না, সে সত্যের সম্মুখে মনবুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল হইতে হয়, চিত্তবৃত্তি সকলকে নিরুদ্ধ করিতে হয়, তখন পরম সত্য জ্যোতির্ম্ময় আত্মা আপনার আলোকেই আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হন। যেমন প্রদীপ জ্বালিয়া সূর্য্যকে খুঁজিতে হয় না, তেমনিই মনবুদ্ধির আলোকে আত্মার সন্ধান করিতে হয় না।

তখনও মনবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যায় না, তবে তাহার কাজ স্বতন্ত্র। আত্মা যখন নিজ আলোকে আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হন, তাহার কিছু ইঙ্গিত আভাস বুদ্ধির সাহায্যে আমরা অপরকে দিতে পারি—সে আভাস কখনই সম্পূর্ণ হয় না, তথাপি তাহার দ্বারা অপরের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, তাহারা নিজেদের মধ্যে আত্মাকে জানিবার, আত্মাকে পাইবার সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই আত্মা সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছে,

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্‌বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২।২৯

যে-বুদ্ধির দ্বারা "আশ্চর্য্যবৎ" আত্মার কিছু আভাস পাওয়া যায় তাহা সাধারণ বুদ্ধি নহে, যে যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধির সাহায্যে আমরা সসীম বস্তুসকলের জ্ঞান সংগ্রহ করি তাহার দ্বারা শাশ্বত, অসীম পূর্ণ আত্মা বা ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া যায় না, সেজন্য

উচ্চতর যুক্তি প্রণালীর প্রয়োজন হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Life Divine গ্রন্থে এই রূপ উচ্চতর যুক্তিপ্রণালীকে Logic of the Infinite বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্ট ইহাকে বলিয়াছেন Transcendental Logic। এইরূপ যুক্তিপ্রয়োগে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাই যাঁহারা শুধু বুদ্ধির দ্বারা দার্শনিক তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিতে চান—এবং আধুনিক মানব তাহাই চায়—তাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শনেই সমধিক তৃপ্তিলাভ করেন, ভারতীয় দর্শন অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য হয়—মনে হয় ইহার মধ্যে ত্রুটি রহিয়াছে, অপূর্ণতা রহিয়াছে। কিন্তু এই ত্রুটি শুধু যুক্তিতর্কের দ্বারা কখনই সংশোধন করা যায় না, ইহার জন্য সাধনালব্ধ অধ্যাত্ম দৃষ্টি, অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রয়োজন হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে মনে করেন তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, পরমতত্ত্ব সকলের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বর্ণনা দিয়াছেন—সেটা মনের ভ্রান্তি, কাণ্ট এই ভ্রান্তিকে Transcendental Illusion বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বুদ্ধি দ্বারা যে অধ্যাত্ম তত্ত্বকে জানা যায় না, এই তত্ত্বটি কাণ্ট দৃঢ়ভাবেই ধরিয়াছিলেন এবং এইখানে ভারতীয় দর্শনের সহিত তাঁহার মৌলিক যোগ রহিয়াছে। কিন্তু ঐসকলের জন্য তিনি যে চলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অজ্ঞাতসারে খ্রীষ্টান dogmatismই অনুসরণ করিয়াছিলেন—এইখানে ভারতীয় দর্শনের সহিত তাঁহার মূলগত প্রভেদ। ভারতীয় দর্শনে চলিত মতকে অন্ধভাবে ধরিয়া লইবার মত dogmatism কোথাও নাই—সেখানে সর্ব্বত্র আছে সূক্ষ্ম ও গভীর যুক্তি এবং সাক্ষাৎ অধ্যাত্ম অনুভূতি এবং এই দুইটির সমর্থনের জন্য শ্রুতির প্রমাণ।

জ্ঞানের দেশ ভারতবর্ষে চিন্তার দৈন্য কেমন করিয়া আসিল তাহার মূল কারণ হইতেছে এই যে, কালক্রমে ভারতবাসীর জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল—শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নহে, দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট সর্ব্বত্রই ঐ শক্তিহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়—বহুশত বৎসর ধরিয়া এই সকল ক্ষেত্রেই প্রচুর সৃষ্টিশক্তি, কর্ম্মশক্তি দেখাইয়া ভারতবাসী সাময়িকভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সকল সভ্যতার ইতিহাসেই এইরূপ উত্থান পতন দেখা যায়, তবে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার পতন কখনই অন্যান্য বহু প্রাচীন সভ্যতার ন্যায় এতদূর অগ্রসর হয় নাই যাহাতে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ বেদ উপনিষদের মধ্যে যে অমৃতধারা সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন তাহা পান করিয়া মৃতকল্প ভারতীয় সভ্যতা পুনঃ পুনঃ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানেও আমাদের চক্ষের সম্মুখে আমরা ভারতের এইরূপই এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী নব অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এই অভ্যুদয় যাহাতে ঠিকপথে পরিচালিত হয়, তাহার ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে সুশৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হয় সেজন্য আমাদের আজ স্পষ্টভাবে বুঝা দরকার কেন ভারতবাসীর এত অধঃপতন হইয়াছিল, পুরাকালে ভারতবাসী জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে প্রচুর জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়াছিল তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়িল কোন্ কারণের বশে। এই কারণ অনুসন্ধান করিলে দুইটি কথা স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। প্রথমতঃ শঙ্কর-প্রচারিত মায়াবাদ ভারতবাসীকে জীবনে বিমুখ, কর্ম্মে বিমুখ করিয়াছে। অবশ্য সকল ভারতবাসীই মায়াবাদের দার্শনিক মর্ম্ম বুঝে নাই অথবা সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী হয় নাই—তথাপি সংসার অনিত্য ও দুঃখময়, ইহা হইতে সরিয়া যাওয়া, নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করাই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য, শ্রেষ্ঠ গতি এই শিক্ষা বিস্তৃতভাবে নানা কৌশলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় ভারতবাসী জীবন ও কর্ম্মে আস্থা হারাইয়াছে, উৎসাহ হারাইয়াছে। মায়াবাদ ভারতবাসীর Will to live বা জীবন-স্পৃহার মূলে আঘাত করিয়া তাহাদের জীবনীশক্তিকে হ্রাস করিয়াছে।

ভারতবাসীর জীবনীশক্তি হ্রাসের দ্বিতীয় কারণ, সামাজিক বিধিনিষেধের অত্যধিক কড়াকড়ি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আত্মা রহিয়াছে, তাহা ভগবানের অংশ, সেই আত্মাই ভিতর হইতে মানুষকে তাহার শ্রেয়ের পথে লইয়া চলিয়াছে—এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে কোন্ জিনিষ কোন্ কর্ম্ম বর্জ্জন করিতে হইবে বা গ্রহণ করিতে হইবে আত্মাই তাহার নির্দ্দেশ দিতেছে, প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রয়োজন বিভিন্ন, সামর্থ্য বিভিন্ন—বাহির হইতে কড়াকড়ি সাধারণ নিয়মের বন্ধনে মানুষকে বাঁধিতে গেলে মানুষের স্বাধীন বিকাশ বিপর্য্যস্ত হয়। যতক্ষণ মানুষ তাহার ভিতরের আত্মার আলোক সাক্ষাৎ ভাবে, পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারে না, তাহার বাহ্য দেহ, প্রাণ মনের ক্রটি ও অপূর্ণতার জন্য অন্তরের বহ্নি আচ্ছাদিত থাকে ততক্ষণ বাহিরের নির্দ্দেশ তাহার সহায় স্বরূপ হইতে পারে—এইখানেই সকল সামাজিক, নৈতিক, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের সার্থকতা। মানুষ বহুদিনের অভিজ্ঞতা হইতে শুভ অশুভ পাপপুণ্য সম্বন্ধে যে-সব মানদণ্ড নির্দ্ধারণ করিয়াছে, অজ্ঞান মানব তাহা হইতে অনেক সাহায্য লাভ করিতে পারে। তথাপি তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতি হইতেছে তাহার মধ্যে ভগবৎ জ্যোতির কণা স্বরূপ যে আত্মা রহিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার করা, তাহার নির্দ্দেশ মত নিজ জীবন ও কর্ম্মকে পরিচালিত করা এবং ইহার জন্য প্রত্যেক মানুষকেই আপন পথে চলিবার জন্য, এমনকি ভুল করিবার জন্য, পাপ করিবার জন্যও স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন—অনেক জিনিষই মানুষকে ঠেকিয়া শিখিতে হয়, অন্যভাবে তাহা

শিক্ষা করা সম্ভব নহে। অতএব সেই সমাজই হইতেছে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণময় যেখানে মানুষকে আপনার পথে চলিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ভারতের প্রাচীন সমাজে এইরূপ স্বাধীনতা ছিল, তাই সেখানে সমাজ-জীবনে এত বৈচিত্র্য দেখা যায়—ইহার এক চরম দৃষ্টান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী। কালক্রমে ভারতে সামাজিক বিধি বন্ধন অত্যধিক কঠোর হইয়া উঠে—মানুষের প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া দমন করিবার নানা চেষ্টা হয়—ইহার ফলে তাহাদের প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আশঙ্কা করিয়াই গীতা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে—"নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিবে—আত্মাকে অবসন্ন করিও না। প্রকৃতিকে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া কি লাভ?" গীতার এই কল্যাণময় শিক্ষা ভারতবাসী সামাজিক জীবনে অনুসরণ করিতে পারে নাই।

ভারতের অধঃপতনের আর একটি কারণ হইতেছে এই যে, অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে ভারতে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেরূপ হয় নাই। চন্দ্রগুপ্তের মত রাজা, চাণক্যের মত মন্ত্রী ভারতে বেশী আবির্ভূত হয় নাই। নতুবা ভারতের ভাগ্যে দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার অভিশাপ ঘটিত না, এবং পরাধীনতা ভারতবাসীর জীবনকে সকল দিক দিয়া খর্ব্ব করিয়া দিত না। যাহাই হউক, এই সব অমঙ্গলের মধ্যেও ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের জীবনে পরাস্ত ও অবনত হওয়ায়, ভারত অন্তর্জীবনের উপর মন দিবার যে প্রেরণা ও সুযোগ পাইয়াছে তাহাতে আধ্যাত্মিকতার বিকাশে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে--ভারতের এই আধ্যাত্মিকতা যে শুধুই ভারতকে নূতন জীবন, নূতন শক্তি প্রদান করিবে তাহাই নহে, আজ সমগ্র জগৎ অধ্যাত্ম আলোকের জন্য ভারতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—বিভ্রান্ত জগৎকে আজ পরম আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যসম্পন্ন ভারতই প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখাইতে পারে।

বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্টের শিক্ষার সহিত আমরা গীতার মহতী অধ্যাত্ম শিক্ষার তুলনা করিতেছিলাম। কাণ্টের শিক্ষা হইতেছে, Duty for the sake of duty, কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য সাধন —এবং এইটিই হইতেছে পাশ্চাত্য নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কোনরূপ ভোগসুখ চাহিয়া কর্ম্ম করিও না, ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিও না, তোমার কর্ত্তব্য কি, তোমাকে কি করিতে হইবে শুধু সেইটি দেখিয়া কর্ম্ম কর। এ পর্য্যন্ত কাণ্টের শিক্ষার সহিত গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের মৌলিক যোগ রহিয়াছে। কিন্তু কোনটা আমার কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য তাহা ঠিক করিব কেমন করিয়া? সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন ত এইটিই। গীতায় অর্জ্জুন এই প্রশ্নটিই তুলিয়াছিলেন।

কর্ত্তব্য করিতে তিনি উন্মুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন্‌টা কর্ত্তব্য সেইটিই তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই—হিংসা না অহিংসা ? নীতি-শাস্ত্র যে দুই রকমই বিধান দেয় ; Reason বা বুদ্ধির দ্বারা দুইটিরই সমর্থন সমানভাবে করা যায়। অতএব কাণ্ট যে বলিয়াছেন, বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে, সাধারণতঃ এই নির্দ্দেশ মানিয়া চলা যায় বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা কর্ত্তব্য-সমস্যার চরম মীমাংসা হয় না, এবং সেইরূপ মীমাংসা দেওয়াই হইতেছে গীতার লক্ষ্য।

কোনও অবস্থায় কাহারও কোনরূপ অনিষ্টাচরণ না করা, হিংসা না করা যেমন উচ্চ আদর্শ, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচাব নিবারণের জন্য বলপ্রয়োগে অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া, এমন কি তাহাকে নিহত করাও তেমনই উচ্চ আদর্শ। মানুষ কোন্‌টার অনুসরণ করিবে ? এই প্রশ্নের উত্তরেই কাণ্টের সহিত গীতার আকাশ-পাতাল প্রভেদ হইয়াছে। কাণ্ট বলিয়াছেন—"Act as if the maxim from which you act were to become through your will a universal law of Nature." অর্থাৎ "এমন ভাবে কর্ম্ম করিবে যেন তোমার আপন কর্ম্মের নিয়ম অপর সকল বুদ্ধিময় জীব উহাদের আপন আপন কর্ম্মের নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করে, তোমার কর্ম্মের নিয়ম যেন তোমার ইচ্ছাশক্তির কল্যাণে এক সার্ব্বভৌম নিয়মে পরিণত হয়। কর্ম্ম করিবার সময় দেখিবে তুমি এমন ইচ্ছা করিতে পার কি না যেন তোমার কর্ম্মের বিধি এক সার্ব্বভৌম নিয়ম হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি সে নিয়মকে আপন কর্ম্মের নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।" কাণ্টের এই হেঁয়ালীপূর্ণ কথা হইতে সন্ধিকালে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে কে কতটা সাহায্য পাইবে জানি না, কিন্তু তিনি নিজে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া যে নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, পাশ্চাত্য নৈতিকতার যাহাতে চরম উৎকর্ষ, সেগুলি মূলতঃ হইতেছে খ্রীষ্টধর্ম্মের নৈতিক আদেশেরই রূপান্তর। কিসে সুখলাভ হইবে এ হিসাব করিয়া কর্ম্ম করিবে না, কারণ "সুখলাভের নিয়মগুলি আপন আপন অবস্থা, দেশ ও কাল অনুসারে বিভিন্ন হইবেই। সুখলাভের নিয়মগুলি নৈতিক নিয়মের ন্যায় অনপেক্ষ ও সুনিশ্চিত (catagorical imperative) হইতে পারে না। নৈতিক নিয়ম সার্ব্বভৌম, উহা সকল ব্যক্তিতে, সকল কালে ও সকল দেশে সমানভাবে প্রযোজ্য। সত্য কথা বলিবে, চুরি করিবে না, পরদারগমন করিবে না, এ-সব নিয়ম দেশ কাল ও পাত্র-ভেদে বিভিন্ন হয় না। এই নৈতিক নিয়মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও সহজ, অভিজ্ঞতার দ্বারা এই জ্ঞান অর্জ্জিত হয় না। ইহা শুদ্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য সহজ জ্ঞান।" কাণ্ট বলিয়াছেন যাহারা ইন্দ্রিয়-প্রেরণা অনুসরণ না করিয়া বুদ্ধি-প্রসূত এই সব নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে তাহারাই free, মুক্ত পুরুষ।

মুক্তি সম্বন্ধে এই মতের সহিত প্লেটো, স্পিনোজা প্রভৃতি অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতের ঐক্য রহিয়াছে।

কিন্তু Reason বা বুদ্ধি এমন নীতি দিতে পারে যাহা সার্ব্বভৌম (universally valid) হইবে, সুনিশ্চিত নির্দ্দেশ হইবে, সকল অবস্থায় সকল মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য হইবে, গীতা তাহা স্বীকার করে না, বস্তুতঃ গীতা এইরূপ নৈতিক বিধিনিষেধের শাস্ত্র নহে। ক্যাণ্টের মতে ইন্দ্রিয়সুখের অনুসরণ না করিয়া বুদ্ধির অনুসরণে কর্ম্ম করাই প্রকৃত নৈতিকতা। কিন্তু Reason বা বুদ্ধির অনুসরণ করিলেই যে ফলকামনা ত্যাগ করিতে হয় তাহা নহে। দেশের মুক্তির জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য যে কর্ম্ম তাহা সকাম কর্ম্ম এবং সম্পূর্ণভাবেই reasonable, যুক্তিযুক্ত, বুদ্ধিসম্মত। গীতা স্বীকার করিয়াছে যে মানুষের নিম্নতন প্রকৃতিতে ইন্দ্রিয়গত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে, তাহার ক্ষুদ্র অহংভাবকে দমন করিতে এই সব বুদ্ধিসম্মত নীতির ও নীতিশাস্ত্রের উপযোগিতা আছে, ইন্দ্রিয়-প্রেরণা অনুসরণ না করিয়া, কাম, ক্রোধ, লোভকে সংযত করিয়া বুদ্ধিগত কোন নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিলে নিম্নতন প্রকৃতির বিক্ষোভ শান্ত হয়, মানুষ উর্দ্ধতর জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। কিন্তু এইটিই উচ্চতম মুক্তির জীবন নহে, ইহা সাত্ত্বিক জীবন, বুদ্ধির অনুসরণ হইতেছে সত্ত্বগুণের অনুসরণ এবং সত্ত্বগুণও বন্ধন করে—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ১৪।৬

তাহা ছাড়া বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া যে আত্ম-সংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম তাহার স্থিরতা নাই। যে-কোন মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় রজোগুণের তাড়নায় সে সংযমের বাঁধ ভাসিয়া যাইতে পারে, এইভাবে কত পণ্ডিত, কত চরিত্রবান মানুষের যে পতন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই (২।৬০)।

মহাত্মা গান্ধী যে-অধ্যাত্ম আদর্শ ধরিয়াছেন তাহাও বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রাপ্ত নৈতিক-আদর্শ। তাহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা নহে। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, দারিদ্র্য, সত্যভাষণ প্রভৃতি কয়েকটি নীতির অনুসরণ করিয়া জীবনকে গঠন করাই তাঁহার আদর্শ। কিন্তু তাঁহার আজীবন পরীক্ষার পর তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য গুরু টলষ্টয়ের ন্যায়ই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মানুষ যতদিন দেহের মধ্যে আছে ততদিন তাহার মুক্তি নাই, কবরে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত যে-কোন মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় মানুষের পতন হইতে পারে—অতএব সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া নিজের উপর পাহারা দিতে হইবে। ক্যাণ্টও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এই পার্থিব

দেহের মধ্যে থাকিয়া মানুষ কখনই ইন্দ্রিয়প্রেরণাকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে পারে না, পূর্ণভাবে নৈতিক-নিয়মের অনুবর্ত্তন করিতে হইলে অনন্ত-জীবন প্রয়োজন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষার অনুসরণ করিয়া ক্যাণ্ট বলিয়াছেন ভগবানের কৃপায় মানুষ পরকালে এক নূতন জীবন, নবজন্ম লাভ করিতে পারে। কিন্তু গীতার মতে মানুষকে এই জীবনে এই মরদেহেই পূর্ণ-মুক্তি লাভ করিতে হইবে, নিম্নতন প্রকৃতির সকল প্রেরণাকে জয় করিয়া অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে নবজন্ম লাভ করিতে হইবে, ইহৈব, প্রাক্শরীর-বিমোক্ষণাৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, সত্ত্বগুণ হইতেছে সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপ—এই ধাপও ছাড়াইয়া উঠিলে তবে আমরা ছাদে উঠিতে পারি এবং তাহাই প্রকৃত মুক্তির অবস্থা। যোগ-সাধনা এই মুক্তিলাভের পন্থা। এই শ্রেষ্ঠ মুক্তিলাভের জন্যই গীতা শেষ পর্য্যন্ত মন-বুদ্ধির সকল আদর্শ, নীতি, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণ লইতে বলিয়াছে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। গীতার এই পরম-বাক্যের কোন আভাস ক্যাণ্টের মধ্যে পাওয়া যায় না। ক্যাণ্ট শুধু এইটুকু বলিয়াছেন যে, তিনি যে-গুলিকে Categorical Imperatives বা সুনিশ্চিত নৈতিক নির্দ্দেশ বলিতেছেন সেইগুলিকেই ভগবানের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া, সাক্ষাৎভাবে ভগবানের আদেশ লাভ করিয়া, কেমনে দিব্য-কর্ম্মের কর্ম্মী হইতে পারা যায়, সেই সাধনার নির্দ্দেশ দেওয়াই হইতেছে গীতার প্রকৃত শিক্ষা। দিব্য-গুরু অর্জ্জুনকে কোন অবশ্য-পালনীয় নীতি (Categorical Imperative) দেন নাই, তিনি তাঁহাকে নিজ বিশ্বরূপ দেখাইলেন, বলিলেন—এখন ধ্বংস করাই হইতেছে আমার ইচ্ছা, অতএব তুমি সকল সংশয় পরিত্যাগ করিয়া আমার আদেশে ধ্বংসকার্য্যে প্রবৃত্ত হও, জগতে আমার ইচ্ছা পূরণের যন্ত্র হও। গীতা যুদ্ধের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখাইয়াছে যে, হিংসার ন্যায় নীতিবিরুদ্ধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মও ভগবানের ইচ্ছার অনুযায়ী হইতে পারে। গীতার মুক্ত পুরুষ কোনও সূত্রবদ্ধ নীতি বা ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন না, তিনি অন্তরাত্মায় ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করেন, তাঁহার শুদ্ধ রূপান্তরিত প্রকৃতি হয় জগতে ভগবানের ইচ্ছা-পূরণের যন্ত্র, তাঁহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানের দিব্য শক্তিই সাক্ষাৎভাবে কর্ম্ম করে, তাঁহার কেবল থাকে ভগবানের ইচ্ছার অবাধ যন্ত্র হইবার পরম আত্ম-গৌরব এবং ভগবানের সহিত নিবিড় মিলনের নিরতিশয় আনন্দ।

ক্যাণ্ট কর্ত্তব্য পালনে যে সুখের কথা বলিয়াছেন তাহা এই গভীর অধ্যাত্ম আনন্দ নহে, তাহা হইতেছে শুষ্ক বুদ্ধিগত আনন্দ। ক্যাণ্ট বলেন, "কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মের সহিত কামনার বিরোধভাব জন্য কর্ত্তব্যপালন দুঃখপ্রদ; সকল কামনাকে

দমন করিয়া নৈতিক-নিয়মের অনুবর্ত্তন সুখকর হইতে পারে না। কিন্তু মানুষের ইচ্ছার এই বশ্যতা স্বাধীন ইচ্ছাকৃত। আবার যে-নৈতিক-নিয়মের বশ্যতা ইচ্ছা স্বীকার ও মান্য করে, সে-নিয়ম বাহিরের কোনও বস্তুর প্রদত্ত নহে ; উহা আত্মারই প্রদত্ত, এবং এই কারণে কর্ত্তব্য পালনে মানুষ এত আত্মগৌরব অনুভব করে। ক্যাণ্টের এই আত্মগৌরবের সহিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের, এপিকটিটাস প্রভৃতি কঠোরতা-বাদীদিগের আত্ম-গৌরব তুলনা করা যাইতে পারে।" (নীতি-বিজ্ঞান—শ্রীবীরচন্দ্র সিংহ)। বলা বাহুল্য যে গীতা এইরূপ কঠোরতাবাদী নহে, ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রেমের আনন্দই গীতার পরম লক্ষ্য। ইন্দ্রিয়সংযমে কঠোরতা এই পরম অধ্যাত্ম-আনন্দ লাভের প্রাথমিক সাময়িক অন্যতম সাধনামাত্র।

ক্যাণ্ট মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। তবে মুক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা, Freedom এবং Free-will এই দুইটি এক জিনিষ নহে। পাপী পাপ করে স্বাধীন ইচ্ছার বশেই, কিন্তু তাই বলিয়া সে মুক্ত পুরুষ নহে। ইন্দ্রিয়প্রেরণাকে সংযত করিয়াই মানুষ মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারে—কিন্তু মানুষ এই মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে, না, ইন্দ্রিয়গত জীবনের মধ্যেই বদ্ধ হইয়া থাকিবে সেটা তাহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে—এবং এই জন্যই গীতা বলিয়াছে, নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিবে, নিজেকে অধোগামী করিও না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষের স্বাধীনতা কতটুকু? বাস্তবিকই কি মানুষ স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করিতে পারে? এই প্রশ্ন লইয়া পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে তর্কের অন্ত নাই। এ-বিষয়ে ইংরাজ কবি মিল্টনের কথাগুলি বিখ্যাত—

Men reasoned high
Of Providence, foreknowledge, will and fate—
Fixed fate, free will, foreknowledge absolute—
And found no end in wandering mazes lost.

তথাপি সাধারণভাবে এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক মনীষীগণ অধিকাংশই Free-will বা স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। জড়-বিজ্ঞান প্রাকৃত জগতে যে সুনিশ্চিত নিয়মের রাজত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহার ফলেই এই মনোভাবের উদ্ভব হইয়াছে। গীতা যেমন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার করিয়াছে, অর্জ্জুনকে বলিয়াছে বিচার করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, তেমনি জোরের সহিতই Determinism of Nature বা প্রকৃতির নিয়মবদ্ধতাও ঘোষণা করিয়াছে,

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥

৩।৩৩

গীতা এই দুইয়ের যে গভীর সমন্বয় করিয়াছে তাহার ভিত্তি হইতেছে সাংখ্যের বিশ্লেষণ। মানুষের সকল কর্ম্মই প্রকৃতির সত্ত্বাদি তিনগুণের কর্ম, ইহাই প্রকৃতির নিয়মবদ্ধতা। শুধু গুণত্রয়ের কর্ম দেখিলে আমরা পাইব কড়াকড়ি কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আত্মা বা অন্তঃপুরুষ রহিয়াছে তাহা প্রকৃতির সকল ক্রিয়ার ঊর্দ্ধে, কোন বিষয়ে তাহা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন, প্রকৃতি তাহার অধীন, তাহার অনুমতি ভিন্ন প্রকৃতি কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। মানুষ যতদিন প্রাকৃত জীবনে আসক্ত, প্রকৃতির গুণত্রয়ের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছে ততক্ষণ তাহার কোন স্বাধীনতা নাই। কিন্তু যখন সে নিজের গভীর অধ্যাত্ম সত্তার সন্ধান পাইয়া সেই আত্মার চৈতন্যে, পুরুষের চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সে হয় মুক্ত, তখন সে ইচ্ছামত প্রকৃতির কার্য্যকে পরিচালিত করিতে পারে। এইরূপই একটা প্রভেদ, অধ্যাত্ম ও প্রাকৃত জীবনের প্রভেদ ক্যাণ্টেরও সকল দার্শনিকতা ও নৈতিকতার ভিত্তি এবং তাহার এই প্রভেদ পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। আমরা বলিয়াছি ক্যাণ্ট এই প্রভেদ পাইয়াছিলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর নিকট হইতে এবং প্লেটো ইহা পাইয়াছিলেন ভারত হইতে। গ্রীক দেশে প্রবল কিম্বদন্তী এই যে, প্লেটো ভারতে আসিয়াছিলেন, এবং কাশীতে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণদের নিকট ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভারতের দর্শন ও উপনিষদের সহিত যে তাঁহার পরিচয় ছিল, তাঁহার লিখিত পুস্তক সকল হইতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ক্যাণ্ট যে sensuous world বা ইন্দ্রিয়ময় জগত এবং super-sensuous world বা অতীন্দ্রিয় জগৎ এতদুভয়ের প্রভেদ করিয়াছেন তাহা সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদেরই অনুরূপ। পুরুষের চৈতন্যে প্রকৃতি যেরূপ প্রতিফলিত হইতেছে তাহাই পরিদৃশ্যমান জগৎ, the world of phenomena, কিন্তু পুরুষ ইহা হইতে বিভিন্ন, the world of things-in-themselves. এই দুইটি জগৎ বিপরীত অথচ ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধটি মানুষের মধ্যে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে—কারণ মানুষ দুই জগতেরই, মানুষ আত্মা এবং প্রকৃতি দুই-ই, প্রকৃতি হিসাবে সে প্রকৃতির কার্য্যকারণশৃঙ্খলার অধীন, সাংখ্যের ভাষায় গুণত্রয়ের অধীন, তাহার কোন স্বাধীনতাই নাই, কিন্তু পুরুষ হিসাবে সে চির-

মুক্ত। মানুষ প্রাকৃত জীবনের মধ্যে থাকিয়াও যে নিজেকে স্বাধীন ব্যক্তি বলিয়া মনে করে, তাহার বিবেক আছে, দায়িত্বজ্ঞান আছে—ইহার মূল হইতেছে পুরুষ বা আত্মা হিসাবে তাহার স্বাধীনতা। এই পর্য্যন্ত সাংখ্যের বিশ্লেষণের সহিত ক্যাণ্টের বেশ মিল রহিয়াছে। কিন্তু ঐ আত্মা বা পুরুষের স্বরূপ ও চৈতন্য লইয়াই হইয়াছে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ। ক্যাণ্ট বলিয়াছেন ঐ আত্মার বা পুরুষের স্বরূপ কি তাহা আমরা কখনই জানিতে পারি না, তাহা thing-in-itself, তাহা কখনই মানবীয় জ্ঞানের গোচর হয় না। অথচ তিনি স্বাধীনতা ও নৈতিকতার আলোচনা করিতে গিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে ঐ আত্মার চৈতন্যের স্বরূপ হইতেছে Reason বা বুদ্ধি। ক্যাণ্টের অনুবর্ত্তী হেগেল (Hegel) আত্মার বা ব্রহ্মের (Absolute Spirit) যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহই থাকে না যে, মানুষের বুদ্ধির অনুরূপ বুদ্ধিই হইতেছে উহার স্বরূপ। হেগেল Spirit এবং Mind, আত্মা এবং মন—এই দুইয়ের কোন প্রভেদ করেন নাই; বস্তুতঃ জার্ম্মান ভাষায় আত্মা ও মন বুঝাইতে একই শব্দ ব্যবহৃত হয় —Geist, হেগেল মানুষের মনের উপমাতেই (analogy) Absolute বা ব্রহ্মের পরিকল্পনা করিয়াছেন। আমরা যেমন তর্কের সময় বাদ, প্রতিবাদ, সমন্বয়, এই ভাবে অগ্রসর হই, তেমনই Absolute হইতে এই জগতের বিকাশ thesis, anti-thesis, synthesis এই ধারায় চলিয়াছে। ইহাই হেগেলের Logic বা Dialectic Method এবং ক্যাণ্টের Logic বা বুদ্ধি মূলতঃ এই একই জিনিষ। জার্ম্মান দার্শনিক Dr. Windelband ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে বলিয়াছেন,

"This (Hegel's) metaphysical logic is of course not formal logic, but in its determining principle is properly Kant's transcendental logic. The only difference is that the 'phenomena' is for Kant a human mode of representation, for Hegel an objective externalising of the Absolute Spirit."

অর্থাৎ, ক্যাণ্ট ও হেগেলের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, ক্যাণ্টের মতে আমরা জগৎকে যেরূপ দেখি, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ (phenomenal world), ইহা কেবল মানুষের দেখিবার ধারা মাত্র, জগৎ (thing-in-itself) বস্তুতঃ এইরূপ নহে। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়-সংবেদন সেই জগৎ হইতে আসিতেছে বটে কিন্তু আমাদের বুদ্ধি সে-সবকে নিজের ভাবে সাজাইয়া পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি করিতেছে। আর হেগেলের মতে, Absolute Spirit বা ব্রহ্ম নিজেকে বাহ্য জগতে এইরূপেই প্রকট

করিয়াছেন। ক্যাণ্টের মতের সহিত যেমন সাংখ্য মতের মিল রহিয়াছে, তেমনই হেগেলের মতের সহিত বেদান্তের মতেরও মিল রহিয়াছে—আর সমস্ত পাশ্চাত্য Idealism বা চৈতন্যবাদের মূল এইখানে। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ সকলেই ক্যাণ্ট ও হেগেলের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মের চৈতন্যকে মানুষের মন বুদ্ধির চৈতন্যের উপমাতেই পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইংরাজ দার্শনিক Green স্পষ্ট ভাষাতেই Absolute (ব্রহ্ম)-কে Universal Mind (বিশ্বাত্মক মন) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, মানুষের মন হইতেছে সেই বিশ্ব-মনেরই খণ্ডরূপ, ব্যষ্টির মধ্যে বিশ্বমনের প্রকাশ। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্ম, আত্মা বা পুরুষ মন নহে, মনের অতীত বস্তু, গীতার ভাষায়, যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। সুষুপ্তি অবস্থায় যখন মনের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়, তখনও যে পরা-চৈতন্য থাকে তাহাই ব্রহ্ম-চৈতন্য—মনের চৈতন্য হইতেছে তাহারই একটি নীচের রূপায়ন। দেহ, প্রাণ, মন—এই তিন লইয়াই হইতেছে মানুষের সাধারণ প্রাকৃত জীবন। মনের ঊর্দ্ধে রহিয়াছে বিজ্ঞান, তাহার ঊর্দ্ধে রহিয়াছে সচ্চিদানন্দ, এই আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা চৈতন্যময়, আনন্দময় একমাত্র সদ্বস্তু। এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কিরূপে নিজেকে জগৎমাঝে প্রকট করিতেছেন তাহা বুঝিতে হইলে শুধু মনের বিশ্লেষণ করিলেই চলিবে না, মন ব্রহ্মকে ধরিতে পারে না, কেবল তাহার কিছু ইঙ্গিত বা আভাষ মাত্র দিতে পারে। মনের ঊর্দ্ধে যে অতি-মানস চৈতন্য রহিয়াছে তাহার মধ্যে উঠিয়া ব্রহ্মের সহিত এক হইতে পারিলেই আমরা এই জগৎলীলার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। নিজেকে যেমন আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি, যুক্তিতর্কের দ্বারা নহে, তেমনই ব্রহ্মকেও সাক্ষাৎভাবে জানি—কারণ আমাদের যে মূল আত্মা তাহা ও ব্রহ্ম একই বস্তু। উপনিষদ এই অতি-মানস চৈতন্যের ইঙ্গিতে পূর্ণ—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ।

—তৈত্তীরিয়—২।৪।১

অর্থাৎ, "বাক্য মনের সহিত যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যে লাভ করিয়াছে, সে আর কোন কিছু হইতেই ভয় পায় না। এই মনোময় হইতে ভিন্ন অন্তর-আত্মা বিজ্ঞানময়, উহা দ্বারাই ইহা পূর্ণ।" পাশ্চাত্য দর্শনে মনবুদ্ধির ঊর্দ্ধে অবস্থিত সেই বিজ্ঞানময় আনন্দময় ব্রহ্মের কোন সন্ধান নাই, যাহাকে জানিলে মানুষ সকল ভয় হইতে মুক্ত হয়,

যারে জানি, যার পানে চাহি',
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার অন্য পথ নাহি।

সাংখ্যের মতে Reason বা বুদ্ধি হইতেছে প্রকৃতির সত্ত্বগুণের ক্রিয়া, পুরুষের শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যে উঠিতে হইলে সত্ত্বগুণের সাহায্যেই এই সত্ত্বগুণকে ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। কাণ্টের মতে মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে বুদ্ধি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত নীতি অনুসারে কর্ম্ম করা। সাংখ্য মতে মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে বুদ্ধি দ্বারা এই বিচার করা যে, প্রকৃতি এবং তাহার গুণত্রয়ই সমুদয় কর্ম্ম করিতেছে, পুরুষ নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী। গীতা সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ গ্রহণ করিয়াছে,

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩।২৭

প্রকৃতিই সব কর্ম্ম করিতেছে, পুরুষ কিছুই করে না, এই তত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, গীতার মতে তিনিই তত্ত্ববিৎ, তিনিই মুক্ত ঃ—

গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বুদ্ধি যখন অহংভাবের বশে প্রকৃতির ক্রিয়াকেই পুরুষের ক্রিয়া বলিয়া মনে করে, ইন্দ্রিয়গত বাহ্য জীবনে আসক্ত থাকে ততক্ষণই মানুষের বন্ধন। পরে যখন বুদ্ধি প্রকৃতির ক্রিয়ার স্বরূপ বুঝিতে পারে, উপলব্ধি করে যে অন্তঃপুরুষ এই ক্রিয়ায় আসক্তি দ্বারা জড়াইয়া পড়িয়াছে, তখনই অন্তঃপুরুষ তাহার মূল মুক্ত ও অক্ষর সত্তায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায়। অতএব দেখা যাইতেছে বুদ্ধির ক্রিয়াতেই মানুষ বদ্ধ হয়, আবার তাহার দ্বারাই মুক্ত হয়, মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। উপনিষদ একবৃক্ষে দুই পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিয়া এই তত্ত্বটিই পরিস্ফুট করিয়াছে। আমরা প্রকৃতির সঙ্গে নিজদিগকে এক করি, তাই তাহার ক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া প্রাকৃত সুখ দুঃখ ভোগ করি, কিন্তু আমাদের মধ্যেই আত্মা রহিয়াছে—তাহা চিরমুক্ত, অক্ষর, আপনাতে আপনি পূর্ণ, আনন্দময়; বুদ্ধির বিকাশে যখন আমরা এই আত্মাকে দেখিতে পাই তখনই আমরা মুক্ত হই, সকল সুখ দুঃখের অতীত হই, তখন আর কোন বন্ধনের ভয় থাকে না,

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্ধি ন বিভেতি কদাচনেতি। তাহা হইলে মুক্তির পন্থা হইতেছে বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও বিকশিত করা, যেন সে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি করে। মানুষের বুদ্ধি রজঃ ও তমঃগুণের ক্রিয়ায় আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এই ভেদ বুঝিতে পারে না, সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে এই মোহ দূর হয়—অতএব মুক্তি-পথের

সাধককে সর্ব্বদা সত্ত্বগুণকে প্রশ্রয় দিতে হইবে, রজঃ ও তমঃগুণের ক্রিয়াকে দমন করিতে হইবে।

কিন্তু আবার সেই প্রশ্ন উঠিতেছে, মানুষের মধ্যে কোন্ গুণ প্রাধান্য করিবে সে বিষয়ে কি মানুষের কোন স্বাধীনতা আছে? গুণসকল ত আপনারাই আপনাদের উপর কর্ম্ম করিতেছে—কখনও একটি বর্দ্ধিত হইতেছে, কখনও আর একটি বর্দ্ধিত হইতেছে—ইহাতে আমাদের কি হাত আছে, কি করিবার আছে? বস্তুতঃ অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কিছুই করিবার নাই, প্রকৃতিই যেমন বন্ধন করে, তেমনি প্রকৃতিই মুক্ত করিয়া দিবে। বলা হয় যে, জগন্মাতা দ্বার ছাড়িয়া না দিলে কোন জীবই মুক্ত হইতে পারে না। এ-কথা এক হিসাবে, এক দিক দিয়া সত্য। কিন্তু ইহা হইতে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে মানুষের কিছু করিবার নাই, প্রকৃতির হস্তে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দেওয়াই মানুষের কাজ, তাহা হইলে ভুল-করা হইবে—আমাদের মধ্যে এখন যে নিম্নতন গুণগুলি প্রবল রহিয়াছে, তাহাদের হস্তে, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দুর্জ্জয় রিপুর হস্তে নিজদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, আত্মাকে অবসন্ন করা হইবে, নিজেই নিজের শত্রুতা করা হইবে—গীতা ঠিক এইটিই অতি স্পষ্টভাষায় নিষেধ করিয়াছে। প্রকৃতির গুণ-সকলই সকল কর্ম্ম করিতেছে এ-কথা সত্য, কিন্তু তাহারা পুরুষের সম্মতি না পাইলে কিছু করিতে পারে না, পুরুষ শুধুই সাক্ষী নহে, পুরুষ অনুমন্তা। এই পুরুষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে প্রকৃতির শুভ অশুভ, ভাল মন্দ ক্রিয়ার বিচার করিতে হইবে, শুভটিকে সমর্থন করিতে হইবে, অশুভটি হইতে দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে।

আবার সেই একই প্রশ্ন উঠিতেছে—প্রকৃতির কোন্ ক্রিয়াটিতে আমরা অনুমতি দিব বা প্রত্যাহার করিব সে-বিষয়ে কি আমাদের কোন স্বাধীনতা আছে? এইখানে যে "আমাদের" বলিতেছি, এই "অহং" ত প্রকৃতিরই সৃষ্টি, প্রকৃতিরই যন্ত্রস্বরূপ বুদ্ধির একটি ক্রিয়া, বুদ্ধির বিকাশে এই অহংভাবের দূর হইলে পুরুষের মুক্তি হইবে, কিন্তু এই বুদ্ধির বিকাশ ত প্রকৃতিই করিয়া দিবে। এ-কথা ঠিকই যে "অহং" প্রকৃতির অধীন, উহার কোনই স্বাধীনতা নাই—তথাপি প্রকৃতির নিয়ম এই যে, "অহং" যে কর্ম্ম করিবে তাহার ফলভোগ তাহাকে করিতে হইবে—"অহং"য়ের যে একটা দায়িত্ববোধ আছে তাহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ, প্রকৃতিই তাহাকে এই দায়িত্ববোধ দিয়াছে, পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি তাহাকে দিয়াছে—এই দায়িত্ব-বোধ লইয়া যে-কর্ম্ম সে করিবে, তাহার ফল সে এড়াইতে পারে না। বলিতে পারা যায় যে, এটা বড় অন্যায়, অবিচার—অহংয়ের কোনই স্বাধীনতা নাই, প্রকৃতি যেমন চালাইবে তেমনই তাহাকে চলিতে হইবে, অথচ

এই একটা ভ্রান্ত দায়িত্ববোধ তাহার মধ্যে আছে বলিয়া তাহাকে ফলভোগ করিতে হইবে! জীব একটা ফাঁদে পড়িয়াছে, একটা কঠিন মায়াজালে জড়াইয়া পড়িয়াছে—ইহা সত্য, কিন্তু এই ফাঁদ জীব নিজেই সৃষ্টি করিয়াছে, এই জালে সে ইচ্ছা করিয়াই জড়াইয়া পড়িয়াছে—

পায়ে পায়ে বাজে আমার আপন হাতের গড়া শিকল।

আবার এই শিকল তাহাকে নিজ হস্তেই খুলিতে হইবে, অন্য পন্থা নাই।

পুরুষ প্রকৃতির খেলার মধ্যে আসিয়াছে, প্রকৃতির মধ্য হইতে দেহ, প্রাণ, মন বিকাশের জন্য, যেন এই প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের মধ্যে সে তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের বিকাশ করিতে পারে। এই কর্মধারাতেই তাহাকে প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে হয়, প্রকৃতির বন্ধন স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যখন এই বিকাশ সম্পূর্ণ হয় তখন সে আপনিই এই বন্ধন ছাড়াইয়া উঠে, উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং। এইটি হইল জীব বা জীবাত্মার দিক দিয়া, সবই তাহার স্বাধীন, স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া—তাহার বন্ধনও স্বেচ্ছায়, মুক্তিও স্বেচ্ছায়—অর্থাৎ তাহার বন্ধনটা সত্য নহে বাহ্যিক, ঐটা কেবল তাহার জগৎ-মাঝে আত্মপ্রকাশের একটা কৌশল। কিন্তু অহংয়ের পক্ষে ব্যাপারটি ঠিক এই রকম নহে, অহং জীব নহে, অহং হইতেছে ঐ কৌশলেরই একটা অংশ। আমাদের অহংয়ের যে দায়িত্ববোধ, ভালমন্দ বিচারের শক্তি—প্রকৃতিই তাহা আমাদিগকে দিয়াছে—প্রকৃতিই আমাদের মধ্যে বিচার করে, প্রকৃতিই আমাদের এই ধারণা উৎপন্ন করে যে আমরা স্বাধীন ভাবে কর্ম করিতেছি—এই ভাবেই আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃত আত্মার, স্বাধীন আত্মার সন্ধান পাই, তাহার মুক্ত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হই। সব কাজটিই হইতেছে প্রকৃতির। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, সাধারণ মানুষের যে স্বাধীনতাবোধ, এটা একটা ভ্রান্তি। ইহা গীতারও মত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও মত। আইনষ্টাইনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছিলেন,—"দার্শনিক অর্থে মানুষের স্বাধীনতায় আমি স্পষ্ট অবিশ্বাসী। প্রত্যেকেই যে শুধু বাইরের চাপেই কাজ করে তা নয়' পরন্তু একটা আভ্যন্তরীণ অনিবার্য্য প্রেরণার বশেও কাজ করে" ("The world as I see it")। কিন্তু দার্শনিক অর্থে মানুষের স্বাধীনতা অস্বীকার করিলেই যে নৈতিকতার, দায়িত্বের লোপ হইবে তাহাও ঠিক নহে। প্রকৃতি মানুষকে প্রেরণা দিয়াছে শুভকে গ্রহণ করিতে, অশুভকে বর্জ্জন করিতে—শুভ অশুভ যদি স্পষ্টভাবে মানুষের সম্মুখে ধরা যায় তাহা হইলে প্রকৃতির প্রেরণার বশেই সে শুভটাকে গ্রহণ করে, অশুভ বর্জ্জন করে। এই জন্য মানুষকে সৎশিক্ষা দিলে তাহার নিশ্চয়ই ফল আছে—শাস্ত্র, নৈতিক

উপদেশ, সৎসঙ্গ এ-সব কিছুই বৃথা নহে। মানুষকে যেমন শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রকৃতির বশেই সে সেইরূপই হয়—অতএব প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ামকতা স্বীকার করিলেও পাপ পুণ্য ভালমন্দ, বিচার বিবেক দূর হয় না—কেবল বলিতে হয় যে এ-সবই হইতেছে মানুষের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া, এবং ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্র ঠিক এই কথাই বলিয়াছে, বলিয়াছে যে যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতির ঊর্দ্ধে উঠে তাহারা পাপ পুণ্যের অতীত হইয়া যায়, বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। আর প্রকৃতিই মানুষকে এই আত্ম-জ্ঞানের দিকে লইয়া যায়—প্রাকৃত ক্রমবিবর্ত্তনের বশে যেমন ক্রমশঃ জড়, প্রাণ, মনের বিকাশ হইয়া পৃথিবীতে মানবের অবির্ভাব হইয়াছে, তেমনই এই বিকাশ ধারারই চরম পরিণতিতে মানুষ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই মর্ত্ত্যদেহেই দিব্যজীবন লাভ করিবে।

তবে প্রকৃতির এই ক্রিয়া স্বাধীন নহে, ইহা পুরুষের অধীন। এই পুরুষের সন্ধান আইনষ্টাইনের দার্শনিক মতের মধ্যে নাই। তিনি বলেন, মানুষের প্রকৃতির মধ্যে শুভ প্রেরণা রহিয়াছে, তাহার বশেই মানুষ উন্নত জীবন লাভ করিবে।* অশিক্ষা ও কুশিক্ষার দ্বারাই মানুষ দুরাচার পাপী হইয়া উঠে। ইহা কিন্তু খ্রীষ্টান মতবাদের বিপরীত। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-মত হইতেছে এই যে, প্রকৃতির মূল প্রেরণা অশুভ, পাপ মানুষের মজ্জাগত—মানুষ শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা নিজেকে কতকটা সংযত, শুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ভগবদ্‌কৃপা ব্যতীত কখনই মানুষ নিজের চেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। গীতার মধ্যে এই-সব বিরোধী মতের সমন্বয় হইয়াছে। বিবর্ত্তনের ক্রমে মানুষ পশুস্তর হইতে উঠিয়াছে। প্রকৃতি-দত্ত যে কাম ক্রোধের সহায়ে পশু আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা করে, মানুষ একরকম উত্তরাধিকার সূত্রেই সেইগুলি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে সেগুলি এখনও খুব প্রবল। তাহা ছাড়া মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে অহংভাবের বিকাশ হইয়াছে—এই অহংভাব অন্যান্য মানুষের সহিত যে বিরোধের সৃষ্টি করে তাহাই হইতেছে মানুষের সকল অশুভ ও পাপের মূল। অহংভাবও প্রকৃতি মানুষকে দিয়াছে যাহাতে সে তাহার ব্যষ্টিত্বকে গড়িয়া

*"এসব সত্ত্বেও কিন্তু আমার মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা যে আমি বিশ্বাস করি যে স্কুল আর ছাপাখানার ভিতর দিয়ে কর্ম্মকরী অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক স্বার্থগুলি যদি জাতিগুলির সুস্থ বুদ্ধিকে ময়লা না করে দিত তাহা হলেই পিশাচ অনেক দিন পূর্ব্বেই অদৃশ্য হয়ে যেত।" ("The World as I see it" by Albert Einstein.)

তুলিতে পারে, তাহার মধ্যে যে ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম সত্তা বা জীবাত্মা রহিয়াছে তাহা আত্ম-প্রকাশের উপযুক্ত আধার পায়, সুযোগ পায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মানুষের চেতনা ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশের ধারাতেই পাপ ও অশুভ অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ যে শুধু জন্ম হইতেই পিতামাতার নিকট হইতে পাপের প্রবৃত্তি পায় তাহা নহে, মানবজাতি যখন পশুজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তখন হইতেই সে পাপ প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই হিসাবে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যে মানুষের Original Sin বা জন্মগত পাপ, আদিম পাপের কথা বলে তাহার মধ্যে সত্য রহিয়াছে। তবে মানুষ যেমন অশুভ প্রেরণা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তেমনই শুভ প্রেরণা ও প্রবৃত্তি লইয়াও জন্মগ্রহণ করে। ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় মানুষের মধ্যে যে মনের বিকাশ হইয়াছে—তাহাতে একদিকে যেমন অহংভাব রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই ভালমন্দ, পাপ পুণ্য বিচার করিবার শক্তি রহিয়াছে এবং অশুভকে বর্জ্জন করিয়া শুভকে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি রহিয়াছে এবং ইহাও তাহার প্রকৃতির অন্তর্গত। দার্শনিক ভাষায় পাপ ও অশুভ যেমন রজোগুণ ও তমোগুণের ক্রিয়া, তেমনই তাহাদের বর্জ্জন, শুভ ও পুণ্যের অনুসরণ হইতেছে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। মানুষের মধ্যে যেমন এই সত্ত্বগুণের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয় তেমনই সে জ্ঞানে ও পুণ্যে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তথাপি সত্ত্বগুণ কখনও সম্পূর্ণভাবে রজোগুণের ও তমোগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পায় না, এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহারাই মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের ক্রিয়াকে অভিভূত করিতে পারে।

অতএব খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যে বলিয়াছে ভগবদ্‌কৃপা ব্যতীত মানুষ কখনই সম্পূর্ণ ভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, ইহাও সত্য। গীতাও বলিয়াছে, প্রকৃতির যে গুণময়ী খেলা (ইহাকেই গীতা মায়া নামে অভিহিত করিয়াছে) ইহাকে অতিক্রম করা অতিশয় কঠিন, যাহারা একান্তভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে কেবল তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিয়া গুণত্রয়ের অতীত হইতে পারে,

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলেই মানুষ পাপ ও অশুভ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। ইহার অর্থ নহে যে, কেবল পুণ্যবান ব্যক্তিই ভগাবানকে চায়—সাধারণতঃ ইহা সত্য বটে। কিন্তু এমনও ঘটে যে অতি দুরাচার ব্যক্তি, পাপের মধ্যে যে ডুবিয়া রহিয়াছে, সহসা সে একদিন তাহার অভ্যস্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হয়—আর সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রকৃতির রূপান্তর

আরম্ভ হয়, সে রক্ষা পায় (৯।৩০)। ইহা হইতে কি প্রমাণিত হয় না যে, মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিষ রহিয়াছে যাহা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির অধীন নহে? সাধারণতঃ মানুষ তাহার অভ্যস্ত প্রবৃত্তির বশে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে কর্ম্ম করে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই—এবং এই সাধারণ নিয়ম অনুসারেই সামাজিক ব্যবস্থা-সকলের প্রবর্ত্তন করা হয়। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। একটা জড় বস্তু যেমন অপরিহার্য্যভাবে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা অনুসারে কর্ম্ম করে—মানুষ ঠিক সেইভাবে কর্ম্ম করে বলিয়া মনে হয় না। একই শ্রেণীর মানুষ একই অবস্থার মধ্যে সকল সময়ে যে একই ভাবে কর্ম্ম করিবে সে-বিষয়ে কোনই নিশ্চয়তা নাই। এইটিকেই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে না কি? চুরি করিতে যে অভ্যস্ত হইয়াছে সে সুযোগ পাইলেই চুরি করে—ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে মানুষ তাহার প্রকৃতির বশ। কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ হইলেও, সহসা একদিন সে সকল প্রলোভনকে জয় করিয়া নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করিতে পারে, এবং এইটিকেই বলা যায় পুরুষকার। তাহার ভিতরে যে আত্মা রহিয়াছে, পুরুষ রহিয়াছে, তাহা প্রকৃতির খেলায় সায় দেয়, ইচ্ছা করিয়াই প্রকৃতির সঙ্গে চলে, তাই মনে হয় প্রকৃতিই তাহাকে চালাইতেছে, প্রকৃতিতে সে বদ্ধ। কিন্তু বস্তুতঃ সে প্রকৃতির দাস নহে, সে প্রভু এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে সে তাহার প্রভুত্ব প্রয়োগ করিতে পারে। কথিত আছে স্বর্গীয় লালাবাবু অসীম ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন—সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি ধনীর পক্ষে যাহা ব্যবহার তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা একদিন শুনিলেন, হাট হইতে ফিরিবার সময় কে বলিল, "বেলা যে পড়ে এল!" অমনি তাঁহার মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হইল, তিনি সব ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলেন। বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গলকে বেশ্যা যখন বলিল, "আমি বেশ্যা, যে মন তুমি আমাতে দিয়াছ, সেই মন যদি ভগবানের উপর দিতে ত তোমার কাজ হইত।"—অমনি বিল্বমঙ্গলের নেশা ছুটিয়া গেল, সে সব ছাড়িয়া ভগবানকে লাভ করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। এ-সব সাধারণ ঘটনা নহে, তথাপি এইরূপ ঘটিয়া থাকে এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষ একেবারে প্রকৃতির অধীন নয়, সে ইচ্ছা করিলেই প্রকৃতির সকল বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিতে পারে। কাহারও সেই ইচ্ছা আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে—ভিতরের অন্তঃপুরুষের প্রেরণায়, কিন্তু ইহার জন্য সৎসঙ্গ, শাস্ত্রোপদেশ এবং অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা সহায় হয়।

আমাদের অহং প্রকৃতিরই সৃষ্টি, সম্পূর্ণভাবে সে প্রকৃতির দ্বারাই চালিত হয়, সে যে পাপ পুণ্য বিচার করে, সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া তাহার রজোগুণ ও তমো-

গুণকে দমিত করে এ সবই প্রকৃতির খেলা। তথাপি মানুষ যে নিজেকে স্বাধীন মনে করে তাহার কারণ তাহার মধ্যে যে আত্মা ও পুরুষ রহিয়াছে, যাহা তাহার নিজেরই উচ্চতর, গভীরতর সত্তা, তাহা বাস্তবিকই স্বাধীন—সেই স্বাধীনতার আভাষ কিছু "অহং" পায় তাই সে নিজেকে স্বাধীন মনে করে। ক্যাণ্ট যে বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে স্বাধীন আত্মা আছে বলিয়াই আমাদের দায়িত্ববোধ আছে একথা ঠিকই—তবে ঐ দায়িত্ব-বোধ হইতেই তিনি যে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এইখানেই তাহার ভুল হইয়াছে, এইখানে তিনি নিজেই নিজের দার্শনিক চিন্তার বিরুদ্ধে গিয়া-ছেন—কারণ বস্তুতঃ এইরূপ যুক্তি তর্কের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। মানুষের দায়িত্ববোধ আছে সত্য, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এই দায়িত্ববোধের সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় ইহাও সত্য, তথাপি এই দায়িত্ববোধ হইতে আত্মা প্রমাণিত হয় না, কেবল তাহা একটি legitimate hypothesis, যুক্তি-সঙ্গত ধারণাই হইয়া থাকে —এইরূপ ধারণাকে ক্যাণ্ট নিজেই Transcendental Illusion বা দার্শনিক ভ্রান্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আত্মাকে যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, আমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রভাবে রজঃ ও তমোগুণের মলিনতা দূর হইলে স্বয়ং-প্রকাশ আত্মা স্বীয় জ্যোতিতে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হন, তখন আর যুক্তি-তর্কের স্থান থাকে না, প্রদীপ জ্বালিয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হয় না।

তাহা হইলে এই বিষয়ে এইটিই হইতেছে গীতার সামঞ্জস্য ও সমন্বয়। মানুষের সকল কর্ম্মই প্রকৃতির সত্ত্বাদি তিন গুণের কর্ম্ম, ইহাই Determinism of Nature, প্রকৃতির নিয়ামকতা। শুধু গুণত্রয়ের কর্ম্ম দেখিলে আমরা পাইব কড়াকড়ি কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা—যেমন বাহ্যজগতে, তেমনই মানুষেরও অন্তর্জগতে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আত্মা বা অন্তঃপুরুষ রহিয়াছে সে নিজে কোন কর্ম্ম না করিলেও তাহার অনুমতি বা সায় ভিন্ন প্রকৃতি কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের কোন্ গুণ কতটা প্রাধান্য করিবে তাহা মানুষের অন্তঃপুরুষের অনুমতির উপরেই নির্ভর করে। এইখানেই মানুষের স্বাধীনতা। যাহারা এই অন্তঃপুরুষের সন্ধান পায় নাই, শুধু প্রকৃতির বাহ্য ক্রিয়াটুকুই দেখে, কেবল তাহারাই Free-will বা স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ বুঝিতে পারে না। মানুষের অহং সর্ব্বতোভাবেই প্রকৃতির গুণ-ত্রয়ের দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু অন্তঃপুরুষ যখন অহংকে প্রভাবিত করে তখন অহংয়ের ভিতর দিয়া প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন অহং সম্পূর্ণভাবে এই অন্তঃপুরুষের সহিত এক হইবে, উহারই মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে তখনই মানুষ হইবে স্বরাট, সম্রাট— তখনই তাহার প্রকৃত মুক্তি। প্রকৃতির কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা স্বীকার করিয়াও তাহার

উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার গতি ফিরান যায়, আধুনিক বিজ্ঞান তাহা স্বীকার করিয়াছে, প্রকৃতির তথাকথিত Determinismএর মধ্যেই একটা Indeterminismএর, অনিশ্চয়তারও সন্ধান পাইয়াছে। একই সামাজিক স্তরের মানুষ একই অবস্থায় পতিত হইলে সমান শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান ধারণা অনুযায়ী প্রায় সকলেই একই ভাবে কার্য্য করে এবং ইহা হইতে মোটামুটি একটা সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যে ঐভাবে কার্য্য করিবে এমন কোন স্থিরতা নাই, দুই এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে এবং তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষের মধ্যে একটা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যেও এইরূপ একটা অনিশ্চয়তা দেখিতেছে—বহু অণুপরমাণু মোটের উপর একই ভাবে কার্য্য করে, এবং বিজ্ঞান যে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিতেছে তাহা ঐরূপ "মোটের উপর" নিয়ম, কিন্তু প্রত্যেক অণুপরমাণু কখন কিভাবে কার্য্য করিবে তাহা কোন অলঙ্ঘ্য নিয়ম বা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না। * মনে হয় যেন অণুপরমাণুর পশ্চাতে একটা স্বাধীন ইচ্ছা কাজ করিতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে গীতার মতের সহিত আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অণুর পিছনে যে আত্মা রহিয়াছে, মানুষের মধ্যেও সেই আত্মা রহিয়াছে—সেই আত্মা প্রকৃতির বশ নহে, প্রকৃতি বাঁধা নিয়মের বশে চলিলেও সেই আত্মা প্রয়োজনমত হস্তক্ষেপ করিয়া প্রকৃতির গতি ফিরাইয়া দিতে পারে এবং দেয় এবং এই ভাবেই প্রকৃতি ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় জড়, প্রাণ, মনের বিকাশ করিয়া ক্রমশঃ অতিমানস ও অতিমানবের বিকাশে অগ্রসর হইয়াছে।

* We still see the action of the vast crowds of molecules or particles conforming to determinism—this is of course the determinism we observe in our every day life, the basis of the so-called law of uniformity of Nature. But no determinism has so far been found in the motions of separate individuals, on the contrary, the phenomena of radio-activity and radiation rather suggest that these do not move as they are pushed and pulled by inexorable forces; so long as we perceive them as in time and space, their future appears to be undetermined and uncertain at every step. They may go one way or another if nothing intervenes to direct their paths: they are not controlled by predetermined forces,

মাত্মানমবসাদয়েৎ—আত্মাকে অবসন্ন করিবে না। অধ্যাত্ম সাধনায় ইহা অপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা বোধ হয় আর কিছুই নাই। নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, দুর্ব্বল ব্যক্তি কখনও আত্মাকে, ব্রহ্মকে, ভগবানকে লাভ করিতে পারে না, অতএব যাহাতে শক্তির অপচয় হয়, দেহ, প্রাণ, মন দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে এমন কোন কাজ করিতে নাই। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ন আত্মানমবসাদয়েন্নাধোনয়েন্নধোগময়েৎ, আত্মাকে অধঃপতিত করিবে না, অধোগামী করিবে না। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারেরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। মধুসূদন আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, নিজেকে অবসন্ন করা উচিত নহে অর্থাৎ সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন করা উচিত নহে।" কিন্তু "উদ্ধরেৎ" শব্দটির দ্বারাই ত এই অর্থটি ব্যক্ত হইয়াছে—অতএব শঙ্করের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে "অবসাদয়েৎ" কথাটি অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আমরা উপরে যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহাতে এই "অবসাদয়েৎ" কথাটির প্রকৃত সার্থকতা বুঝা যায়—নিজেই যখন নিজের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে, তখন এমন পন্থা অনুসরণ করা উচিত নহে যাহাতে শক্তির অপচয় হয়, আত্মা অবসন্ন হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ লোকে যে-ভাবে আত্মাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে, সাধনা করে তাহাতে অনেক সময়েই বিপরীত ফল হয়, সেইজন্যই গীতা সাবধানে জ্ঞানের সহিত অগ্রসর হইতে বলিয়াছে, কারণ অজ্ঞান অন্ধতার বশে যদি আমরা নিজেই নিজের শক্তি ক্ষয় করি তবে নিজেই নিজের প্রতি পরম শত্রুতা করা হইবে, আর তখন অন্য কেহ আসিয়া আমাদের উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে না।

শক্তি ক্ষয় হয় কিসে? কাম ক্রোধাদি রিপুর হস্তে নিজদিগকে ছাড়িয়া দিলে শক্তি ক্ষয় করা হয়, আত্মাকে অবসন্ন করা হয়, অতএব কখনই রিপুর বশ হইতে নাই, কামক্রোধাদির প্রেরণায় কোন কর্ম্ম করিতে নাই। আমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ ও বুদ্ধির যতটুকু বিকাশ হইয়াছে তাহারই আলোকে ভাল মন্দ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিচার করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়—এই ভাবেই আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার সাধন করিতে হয়। আবার আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে-সব প্রেরণা রহিয়াছে সে-সবকে যদি জোর করিয়া নিগ্রহ করা যায় তাহা হইলেও শক্তি ক্ষয় হয়, আত্মা অবসন্ন হইয়া পড়ে। আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়সংযমের নামে অনেকেই নিজের উপর অত্যাচার করেন, তাহাতে ফল ভাল হয় না। সমাজ শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য নানা বিধিনিষেধ রচনা করে, সাজা

---

but only by the statistical laws of probability. The only determinism of which modern physics is at all sure is of a merely statistical kind.—The New Background of Science by Sir James Jeans,

ও পুরস্কারের দ্বারা মানুষকে সে-সব পালন করিতে বাধ্য করে। সমাজের বাহ্য শৃঙ্খলা রক্ষা প্রয়োজন, সেজন্য এ-সব বিধিনিষেধের কিছু উপযোগিতা আছে—কিন্তু তাহাদের মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠে, তখনই আচার অত্যাচারে পরিণত হয়—এইভাবে অনেক সভ্য সমাজেই মানুষের প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে, সমাজ ধীরে ধীরে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। বাহিরের চাপে মানুষ নিজেকে উন্নত করিতে পারে না, নিজের চেষ্টাতে নিজের ভিতর হইতেই তাহাকে ঊর্দ্ধগামী হইতে হইবে—অতএব মানুষকে যত স্বাধীনতা দেওয়া হয় ততই মঙ্গল। মানুষকে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া দেখিতে হইবে যে তাহার মধ্যে শুভ কি রহিয়াছে অশুভ কি রহিয়াছে, নিজের অন্তরের আলোকে এই শুভ অশুভের প্রভেদ করিতে হইবে, প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে পুনঃ পুনঃ অশুভকে বর্জ্জন করিতে হইবে, শুভকে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এইভাবেই মানুষ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি লাভ করিবে (তৃতীয় অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

প্রকৃতিকে সকল রকমে নিগ্রহ করাকেই অনেকে ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যাত্ম সাধনা বলিয়া মনে করেন—কিন্তু ইহা মিথ্যাচার ও অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায়। কোন বাসনা কামনা যখন খুব প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাকে কিছু ভোগ দিয়া কতকটা প্রশমিত করিলে পরে তাহাকে জয় করা সহজ হয়। নতুবা প্রবল বেগের উপর জোরজবরদস্তি করিলে আত্মশক্তি, প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে। নিজেই শান্তভাবে বিচার করিয়া এইরূপ সংযম অভ্যাস করিতে হয়। ভোগের মধ্যে পড়িলেও অবসন্নতা আসে—গীতা উভয়দিকেই সাবধান করিয়া দিয়াছে। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কতকগুলি সত্য প্রেরণা আছে—সেগুলি আমাদের সত্তার অন্তর্নিহিত, তাহাদিগকে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা কল্যাণকর হয় না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Mother পুস্তকে মহালক্ষ্মী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"Ascetic bareness and harshness are not pleasing to her nor the suppression of the heart's deeper emotions and the rigid repression of the soul's and the Life's parts of beauty. For it is through love and beauty that she lays on men the yoke of the Divine." অর্থাৎ "তপস্বীর রিক্ততা ও রুক্ষতা, হৃদয়ের গভীরতর আবেগ সব দমন, অন্তরাত্মায় এবং জীবনে সৌন্দর্য্যের যাবতীয় অভিব্যক্তি রূঢ়ভাবে নিষ্পেষণ, তাঁর তৃপ্তিকর নয়। কারণ ভালবাসা ও সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়েই তিনি মানবকে ভগবানের পাশে আবদ্ধ করেন।"

প্রকৃতির মধ্যে যে- সব প্রেরণা মূলগত নহে, পরন্তু যেগুলি অবান্তর ও বিকার-স্বরূপ—যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা ইত্যাদি, এইগুলিকেই দমন করিতে হইবে, নিগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু শুধু নিগ্রহ করিলেই যে ইহারা দূর হইবে তাহা নহে। পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ বিচার করিতে হইবে, আমাদের মধ্যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে আত্মা রহিয়াছে, অন্তঃপুরুষ রহিয়াছে তাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির বিকার-সকলকে পুনঃ পুনঃ বর্জ্জন করিতে হইবে—তাহা হইলেই প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জন হইতে আত্মার বা পুরুষের উদ্ধার সাধন করা হইবে (৫।৭ শ্লোকের ব্যখ্যা দ্রষ্টব্য)।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ। আত্মাই আত্মার বন্ধু। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিজেই নিজের বন্ধু কারণ অন্য কেহ সংসার হইতে মুক্তিলাভের সহায় স্বরূপ বন্ধু হয় না ; আর পুত্রাদি যে লৌকিক বন্ধু তাহারা স্নেহানুবন্ধ জন্মাইয়া বন্ধনের কারণই হইয়া থাকে। লৌকিক সম্বন্ধসকলের মূলে রহিয়াছে অহংভাব, "আমার" "আমার" ভাব। মূল আত্মসত্তায় সকল মানুষই আমাদের আত্মীয়, কারণ এক আত্মাই সকলের আত্মা ; কিন্তু অজ্ঞান অহংভাবের বশে মানুষ নিজের পুত্রাদিকেই আত্মীয় বলিয়া মনে করে—অর্জ্জুন এই অহংভাবের বশেই তাঁহার ভগবদ্‌দত্ত কর্ম্ম হইতে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন। এই অহংভাব বর্জ্জন করা অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য প্রথম প্রয়োজন এবং গীতা পুনঃ পুনঃ এই শিক্ষা দিয়াছে, নিরাশী নির্ম্মম হইতে বলিয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকে গীতা সেই প্রসঙ্গ অবতারণা করে নাই। এখানে গীতার বক্তব্য হইতেছে এই যে, আমাদের মধ্যে যে ঊর্দ্ধতর আত্মা রহিয়াছে তাহারই সাহায্যে আমাদের নিম্নতর আত্মাকে বশীভূত করিতে হইবে—এইভাবে যে নিজেকে বশীভূত করিয়াছে, সেই নিজে নিজের বন্ধু। সাধারণ লৌকিক ধারণা আছে যে, বংশধরগণ পিণ্ডদান করিলে পরলোকগত পূর্ব্ব-পুরুষগণের উদ্ধার সাধন হয়, গীতা এই মতের সমর্থন করে নাই। বস্তুতঃ পিণ্ডের দ্বারা পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি বা মুক্তি হয় এই বিশ্বাস হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল তাহা বিস্ময়ের বিষয়, * কারণ হিন্দু পুনর্জন্ম স্বীকার করে, কর্মফল স্বীকার করে। মৃত ব্যক্তিগণ কোন স্থানে গিয়া তাহাদের বংশধরগণের পিণ্ডের আশায় উন্মুখ হইয়া থাকে—এ-ধারণা হিন্দুমতের বিরোধী। মৃত্যুর পর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া সকলেই আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে পুনরায় নূতন জন্ম গ্রহণ করে—তাহা হইলে যাবজ্জীবন পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের সার্থকতা কি ?

* সম্ভবত ভারতের আদিম অনার্য্যগণের নানা প্রথার সহিত এই প্রথাটিও হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। অনেক আদিম ধর্ম্মে পূর্ব্বপুরুষ-পূজা প্রচলিত আছে।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গীতায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে—"নিজের উদ্ধারের উপায় নিজেই করিতে হইবে, পুত্রপৌত্রাদির পি:গুর উপর নির্ভর করিয়া কোন লাভ নাই।"

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠে। নিজের চেষ্টাতেই যদি নিজের উদ্ধার সাধন করিতে হয় তাহা হইলে মুক্তিলাভের জন্য ভগবদারাধনার সার্থকতা কি? ভগবদ কৃপার স্থান কোথায়? সাধক কবি তাই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—

যদি আপনারই কর্ম্মফল ফলিবে আমারে,
তারা, তোমার ভরসা বল কে করে?

বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভের জন্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ দেখাইয়া দিয়াছেন—"সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক আচরণ, সম্যক আজীব, সম্যক চেষ্টা, সম্যক ধ্যান ও সমাধি। সংক্ষেপতঃ, আমবা যদি জগৎকে চঞ্চল, দুঃখাত্মক অনাত্মরূপে ধারণা করিবার চেষ্টা করি, ইন্দ্রিয়ভোগ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করি, মিথ্যা, পরনিন্দা, কর্কশ ও অসার বাক্য পরিত্যাগ করি, প্রাণী হিংসা, চৌর্য্য ও ব্যাভিচার বর্জ্জন করি, সৎপথে জীবিকার্জ্জন করি, এবং সৎগুণাবলী অর্জ্জন ও পরিরক্ষণে যত্নবান হই তাহা হইলে আমাদের অবিদ্যা, অজ্ঞান বা তৃষ্ণার নিরসন হইবে। ইহাতেই আমাদের নির্ব্বাণ ঘটিবে—দুঃখ ও জন্মান্তর পরিগ্রহণের অবসান ঘটিবে। এই নির্ব্বাণ মনুষ্য বা দেবতা কেহ কাহাকেও দিতে পারেন না। বুদ্ধ পথ-প্রদর্শক মাত্র। নিজের চেষ্টা দ্বারা অবিদ্যা নাশ ব্যতিরেকে নির্ব্বাণলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহা চেষ্টা ও সাধন সাপেক্ষ।"

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রেও অনুরূপ কথা বলা হইয়াছে, বুদ্ধের আষ্টাঙ্গিক মার্গ যোগশাস্ত্রের আষ্টাঙ্গিক মার্গেরই প্রকার ভেদ। যোগশাস্ত্র বলেন, যম নিয়ম আসনাদির দ্বারা মনকে নিশ্চল করিলে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়। বিষয়াসক্ত মনই সঙ্কল্প বিকল্পের ভিত্তিভূমি, মনকে যদি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করা যায় তবে উহা আত্মস্বরূপে অবস্থান করে—"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং" (যোগসূত্র ১।৩)। ইহাই প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জন হইতে আত্মার উদ্ধার। ইহা নিজ চেষ্টা ব্যতীত সংসাধিত হয় না, ইহার জন্য যত্ন করিতে হয়, অভ্যাস করিতে হয়, তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ (যোগসূত্র ১।১৩)।

অন্যদিকে ভক্তি মার্গের শিক্ষা হইতেছে এই যে, ভগবদ্কৃপা ব্যতীত নিজের চেষ্টায় মানুষ কথনই নিজের উদ্ধার সাধন করিতে পারে না। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এই মতবাদের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। খ্রীষ্টান মতে মানুষ মাত্রেই জন্মাবধি পাপী। ভগবান খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন মানবজাতিকে এই মূলগত পাপ হইতে উদ্ধার করিবার

জন্য। তিনি নিজে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া সমস্ত মানবের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। এখন যে-কোন মানব তাঁহার শরণাগত হইবে, নিজ পাপের জন্য অনুশোচনা করিবে, খ্রীষ্ট-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, শেষ বিচারের দিনে সে পাপমুক্ত বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাকে আর পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না, সে চিরকাল স্বর্গে বাস করিবে। যীশুখ্রীষ্ট মানবের হইয়া দুঃখবরণ করিলেন তাহাতেই মানবজাতির মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইল, একের দুঃখবরণে অন্যের উদ্ধার হইল—ইহাকেই বাইবেলে Vicarious suffering বলা হইয়াছে। এই মত আপাতদৃষ্টিতে গীতার মতের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ মূলে কোন বিরোধই নাই। গীতা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের ন্যায় কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রচার করে নাই। লৌকিক ধর্ম্মসকল হইতেছে এমন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহাদের সমর্থনে কোন যুক্তিপ্রমাণ নাই, সে-গুলিকে অন্ধভাবেই মানিয়া লইতে হয়—এই সব বিশ্বাসকেই creeds, dogmas বলা হয়। এই সব বিশ্বাসের মধ্যে অনেক সময় সত্য ও অসত্য মিশ্রিত থাকে, সাধারণ লোকের মনের উপযোগী করিয়া তাহাদিগকে প্রচারিত করিতে হয়—সেজন্য দেশে দেশে, যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই সব ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে যে সনাতন অবিমিশ্র সত্য রহিয়াছে গীতা তাহাই দেখাইয়া দিয়াছে। মানুষ যে জন্মাবধি পাপী, গীতা তাহা স্বীকার করে—কিন্তু এই পাপের মূল কোথায় গীতা তাহা দেখাইয়া দিয়াছে এবং কেমন করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইতে হয় তাহাও দেখাইয়া দিয়াছে। মানুষের প্রকৃতিতে যে রজঃ ও তমঃ রহিয়াছে, ইহারাই সকল পাপের মূল—মানুষকে নিজের চেষ্টাতেই তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। তবে ইহার অর্থ নহে যে সে আর কাহারও কোন সাহায্য পাইবে না, বা শুধু নিজের চেষ্টাতেই সে মুক্ত হইতে পারে। যে মানুষ নিজের উন্নতির জন্য প্রযত্ন করে ভগবান তাহাকে সাহায্য করেন, গীতা যেমন বলিয়াছে আত্মাই আত্মার বন্ধু, তেমনই আবার স্পষ্ট বলিয়াছে যে, ভগবানই সর্ব্বভূতের বন্ধু,

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতনাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥৫।২৯

ভগবান মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য মানবরূপে অবতীর্ণ হন ইহা গীতারও শিক্ষা। যীশুখ্রীষ্ট বলিতেন, Repent, all ye sinners. Come unto me, all ye who labour and are burdened, and I will refresh you. অর্থাৎ "হে পাপীগণ! অনুতপ্ত হও। পাপীতাপী কে কোথায় আছ, আমার নিকট এস, আমি তোমাদের প্রাণে শান্তি দান করিব।" গীতাতেও অবতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।

"এই দুঃখময় অনিত্য সংসারের মধ্যে আসিয়া কে দুঃখ ভোগ করিতেছ, এস, আমার ভজনা কর, আমি তোমাদের উদ্ধার সাধন করিব।" তবে যীশুখ্রীষ্ট আসিয়া যে দুঃখ-বরণ করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সেইটির উপরেই সমধিক জোর দিয়াছে; গীতায় শ্রীকৃষ্ণের দুঃখবরণের কোন কথা নাই—তিনি নিজের জীবনে যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাঁহার যে দিব্য জন্ম, দিব্য কর্ম্ম—তাহারই অনুসরণ করিয়া মানুষ মুক্তিলাভ করিবে (৪।৯)। ভগবান যখন মানবের কল্যাণের জন্য মানবরূপ গ্রহণ করেন তখন তাঁহাকে মানবজীবনের সকল দুঃখ ও অপূর্ণতাই বাহ্যতঃ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু সেই সবকে কেমন করিয়া জয় করিতে হয় তাহা তিনি নিজ দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইয়া দেন, নিজ চরিত্রের মহিমায় লোক-সকলকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন, সত্য বাণী প্রচার করিয়া তাহাদের সকল সংশয় দূর করিয়া দেন। কিন্তু অবতারের আগমনের ফল তাহারাই লাভ করিতে পারে, যাহারা তাঁহার দিকে ফিরিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হয়—এইখানেই মানুষের নিজের চেষ্টাব স্থান রহিয়াছে; মানুষকে নিজের অবনত অবস্থা হইতে উঠিবার সঙ্কল্প করিতে হইবে, ভগবানেব শরণ লইতে হইবে—যে মানুষ তাহা করে সেই নিজে নিজের বন্ধু। এবং যে ভগবানকে, অবতারকে অগ্রাহ্য করিয়া নিম্ন প্রকৃতির তুচ্ছ ভোগসুখের মধ্যে আসক্ত হইয়া থাকে সে নিজেই নিজের শত্রুতা সাধন করে। খ্রীষ্টানধর্ম্মও বলে না যে, মানুষ নিজে কোন চেষ্টা না করিলেও ভগবান কৃপাবলে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দিবেন। ধর্ম্মের অনুশাসন অনুযায়ী যাহারা পবিত্র জীবন যাপন করিবে তাহারাই ভগবদ্ কৃপালাভের অধিকারী—অতএব মানুষের নিজের চেষ্টা ও ভগবদ্কৃপা এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, পরন্তু এই দুইয়ের সমবায়েই মানুষ পরম গতি লাভ করিতে পারে। তবে যাহারা ব্রহ্মকে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ নির্ব্যক্তিক বলিয়া ধারণা করেন, তাহাদের মতে মানুষকে নিজের চেষ্টাতেই মুক্তিলাভ করিতে হয়। তাহাদের পন্থাই জ্ঞানযোগ—নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম কাহাকেও তাঁহার নিকট পৌছিতে সাহায্য করেন না। বৌদ্ধদের শিক্ষা কতকটা ইহারই অনুরূপ। গীতা এইরূপ সাধনারও উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে—ইহাও একটা পথ, তবে দেহধারী মনুষ্যের পক্ষে ইহা কঠিন পথ (১২।৫)। যাহারা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনের সমবায়ে ভগবান পুরুষোত্তমের উপাসনা করে, ভগবান নিজে তাহাদিগকে এই দুঃখময় মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া দেন,

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥১২।৭

তবে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা সাধকের নিজ চেষ্টার উপরেই জোর দিয়াছে, কারণ ইহা না হইলে ভগবদ্ কৃপাও লাভ করা যায় না। বেদেও আছে "ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ" (ঋক্ ৪।৩৩।২১)—নিজে শ্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দেবতারাও সাহায্য করেন না।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন উঠে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের দ্বারা যদি এ-জন্মে মানুষের ভাগ্য নির্ণীত হয় তাহা হইলে মানুষ এ-জন্মের চেষ্টার দ্বারা কেমন করিয়া নিজের উদ্ধার সাধন করিবে? মানুষ এ-জন্মে চেষ্টা করিয়া যাহা করে তাহাকেই পুরুষকার বলা হয়, আর পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মকেই দৈব নামে অভিহিত করা হয়। দৈব ও পুরুষকার এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি প্রবল ইহা লইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। অনেকেই বলিয়া থাকেন, ভারতবাসী অতিমাত্রায় দৈব বা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে বলিয়াই তাহারা সাংসারিক জীবনে উন্নতি করিতে পারে নাই। কিন্তু অদৃষ্টবাদ ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া নহে, সকল দেশে সকল যুগেই লোক অদৃষ্ট বিশ্বাস করিয়াছে—সেজন্য যদি তাহাদের অবনতি না হইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতের অবনতির জন্য অদৃষ্টবাদকে দায়ী করা সমীচীন হয় না। আরও একটি কথা এই যে, ইংরাজীতে যাহাকে Fate বলা হয়, ভারতে অদৃষ্ট বা দৈব বলিতে ঠিক তাহা বুঝায় না। Fate বলিতে বুঝায় মানুষের জীবনের উপর এমন কোন শক্তির প্রভাব আছে যাহা খেয়াল মত কার্য্য করে, তাহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। গ্রীকজাতির মধ্যে বিশ্বাস ছিল, তিন ভগ্নী পাশা খেলিয়া মানুষের ভাগ্য নির্ণয় করে —তাহারাই Fate, নিয়তি, ভাগ্যদেবী। তাহাদের পাশায় হঠাৎ যাহা উঠিবে, মানুষের জীবনের গতি সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইবে। মানুষের জীবনের অনেক অংশ যে অনিশ্চয়তার অধীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহা হইতেই ঐরূপ বিশ্বাসের উদ্ভব হইয়াছে। দেখা যায় একটা মানুষ সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অতিকষ্টে জীবনযাত্রার উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, কখনও বা তাহাও পারে না, আবার আর একটা লোকের এমনই যোগাযোগ হইয়া যায় যে সে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠে। তাহা হইলে মানুষের চেষ্টা অপেক্ষা অদৃষ্টকেই প্রবল বলা ঠিক হয় না কি? ভারতের অদৃষ্টবাদ কিন্তু ঠিক এইরূপ নহে—কোন অদৃশ্য শক্তি মানুষের জীবন লইয়া জুয়া খেলিতেছে হিন্দু তাহা বিশ্বাস করে না। হিন্দুমতে অদৃষ্ট আর কিছুই নহে, তাহা মানুষের আপন আপন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল—এ-জন্মের কর্ম্ম দেখা যায়, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম সেরূপ দেখা যায় না, জানা যায় না অথচ তাহা ফল প্রসব করে, এই জন্যই তাহাকে অদৃষ্ট বলা হয়—ইহারই

আর এক নাম দৈব। আর এ-জন্মে যে কর্ম্ম করা হয় তাহাকে বলা হয় পুরুষকার। ইহাতে মানুষের চেষ্টাকে নিম্নস্থান দেওয়া হয় না, বরং খুবই উচ্চস্থান দেওয়া হয়—কারণ এই মত অনুসারে মানুষের কর্ম্ম কেবল তাহার বর্ত্তমান জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, পরন্তু তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করে—ইহাতে মানুষের দায়িত্বজ্ঞান অনেক বাড়িয়া যায়। বস্তুতঃ অদৃষ্টবাদ মানিয়াও শত শত বৎসর ধরিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারতবাসী যে প্রচুর কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, অদৃষ্টবাদ কর্ম্মের বিরোধী নহে, অদৃষ্টবাদের দ্বারাই ভারতের অবনতি হয় নাই। যখন মানুষ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, বর্ত্তমানে কোন চেষ্টা করে না, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে এই বিশ্বাসকে ধরিয়া বর্ত্তমানে প্রয়োজনীয় কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, তখনই সে ভুল করে, কর্ম্মহীনতার জন্য তাহার অবনতি অনিবার্য্য হয়। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রে সর্ব্বত্র এইরূপ ভ্রান্ত অদৃষ্টবাদকে নিন্দা করা হইয়াছে। এ-বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় মতটি মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায় সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। সেই অধ্যায় হইতে আমরা এখানে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রমুপ্তং ভবতি নিষ্ফলম্।
তথা পুরুষকারেন বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥ ৭

"ক্ষেত্র কর্ষিত হইলেও বীজ না হইলে যেমন তাহা ফল প্রসব করে না তেমনই পুরুষকার বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যতীত দৈব কোন ফল প্রসব করে না।"

অকৃত্বা মানুষং কর্ম্ম যো দৈবমনুবর্ত্ততে।
বৃথা শ্রাম্যতি সংপ্রাপ্য পতিং ক্লীবমিবাঙ্গনা॥২০

"যে ব্যক্তি মানবীয় চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, নপুংসক স্বামীর স্ত্রীর ন্যায় তাহাকে ব্যর্থ হইতে হয়।"

আত্মৈব হ্যাত্মনঃ বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী কৃতস্যাপ্যকৃতস্য চ॥ ২৭

"আত্মাই মনুষ্যগণের বন্ধু ও শত্রু। আত্মাই মানবগণের সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের সাক্ষী-স্বরূপ।"

দৈবানাং শরণং পুণ্যং সর্ব্বং পুণ্যৈরবাপ্যতে।
পুণ্যশীলং নরং প্রাপ্য কিং দৈবং প্রকরিষ্যতি॥২৯

"মনুষ্য পুণ্যবলে সমুদয় দেবলোক লাভ করিতে পারে। পুণ্যবান ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রতিহত হইয়া যায়।"

পাণ্ডবানাং হৃতং রাজ্যং ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্মহাবলৈঃ ।
পুনঃ প্রত্যাহৃতং চৈবং ন দৈবাদ্ভুজসংশ্রয়াৎ ॥৪০

"প্রবল পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কর্তৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত পাণ্ডবগণ ভুজবলেই তাহা পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন, দৈববলে নহে।"

দৈব ভোগ ঐশ্বর্য্য আনিয়া দিলেও পুরুষকারবিহীন লোক তাহা রক্ষা করিতে পারে না, ভোগ করিতে পারে না—

বিপুলমপি ধনৌঘং প্রাপ্য ভোগান্ স্ত্রিয়ো বা
পুরুষ ইহ ন শক্তঃ কর্ম্মহীনো হি ভোক্তুম্ ।
সুনিহিতমপি চার্থং দৈবতৈ রক্ষ্যমাণং
পুরুষ ইহ মহাত্মা প্রাপ্নুতে নিত্যযুক্তঃ ॥ ৪৫

"ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদয় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু উদ্‌যোগপরায়ণ মহাত্মারা পুরুষকার প্রভাবে পাতালগত দেবরক্ষিত রত্নও লাভ করিতে পারেন।"

পাপমুৎসৃজতে লোকে সর্ব্বং প্রাপ্য সুদুর্লভম্ ।
লোভমোহসমাপন্নং ন দৈবং ত্রায়তে নরম্ ॥৪২
যথাগ্নিঃ পবনোদ্ভূতঃ সুসূক্ষ্মোঽপি মহান্ ভবেৎ ।
তথা কর্ম্মসমাযুক্তং দৈবং সাধু বিবর্ধতে ॥৪৩

"দুর্লভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপীদিগের অধিকৃত হইয়াও উহাদিগকে পরিত্যাগ করে। লোভ-মোহের বশীভূত নরাধমগণকে দৈব কখনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র হুতাশন বায়ু সহকারে বিপুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ দৈব পুরুষকার দ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হয়।"

ন চ ফলতি বিকর্মা জীবলোকে ন দৈবং
ব্যপনয়তি বিমার্গং নাস্তি দৈবে প্রভুত্বম্ ।৪৭

"ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা কখনই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না। আর যাহারা কুপথে পদার্পণ করে, দৈব পুরুষকারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না। যেমন শিষ্য গুরুর অনুগমন করে, তদ্রূপ দৈবকে পুরুষকারের অনুসরণ করিতে হয়।"

অতএব দেখা যাইতেছে কর্ম্মবিমুখ অদৃষ্টবাদ ভারতের আদর্শ, ভারতের শিক্ষা নহে। কোন অনির্দ্দিষ্ট শক্তি খেয়ালমত আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে এই পাশ্চাত্য বিশ্বাস মানুষকে কর্ম্মে উৎসাহহীন করিতে পারে। ভারতবাসী জানে কর্ম্মের

দ্বারাই তাহার দৈব সৃষ্ট হইয়াছে, কর্ম্মের দ্বারাই তাহা জিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্ব্বজন্মে যদি আমি ভাল কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহা আমার এজন্মের কর্ম্মে সহায় হইবে, পূর্ব্বে আমি যদি মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকি, এজন্মের কর্ম্মের দ্বারা তাহার ফল প্রতিহত, নিরাকৃত হইবে—আমার বর্ত্তমান কর্ম্মের দ্বারা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হইবে—এই বিশ্বাস যাহাদের আছে তাহারা কখনই কর্ম্মে নিরুৎসাহ হয় না। ভারতবাসী অদৃষ্টের দোহাই দিয়া কর্ম্মে আলস্য দেখাইয়াছে কেবল তখন—যখন কালক্রমে তাহাদের মধ্যে প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার জন্য ভারতের আদর্শ, ভারতের অদৃষ্টবাদ বা কর্ম্মবাদ দায়ী নহে।

মানুষ নিজের চেষ্টাতেই সব কিছু করিতে পারে না, ঐহিক জীবনেও তাহাকে অনেক বিষয়ে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়—কিন্তু এইরূপ সাহায্য পাওয়াও নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। মানুষের নিজের ব্যবহারের ফলেই কেহ তাহার বন্ধু হয়, কেহ তাহার শত্রু হয়। অতএব গীতা যে জোর দিয়া বলিয়াছে আত্মাই আত্মার বন্ধু—ইহা খুবই ঠিক। শুধু অপরে নহে, আমরা নিজেরাই যে নিজেদের বন্ধু বা শত্রু হই, সেটাও নিজেদেরই ব্যবহারের ফলে। আমাদের মধ্যেই দুই রকম আত্মা বা সত্তা রহিয়াছে—একটি ঊর্দ্ধতর, একটি নিম্নতর। যে ব্যক্তি তাহার ঊর্দ্ধতর আত্মার দ্বারা তাহার নিম্নতর আত্মাকে বশীভূত করিয়াছে, তাহার আত্মা তাহার বন্ধু; কিন্তু যে ব্যক্তি "অনাত্মা", যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধতর আত্মাকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে তাহার নিম্নতর আত্মা শত্রুবৎ হয় এবং শত্রুবৎ ব্যবহার করে।

আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। মানুষ যখন নিজে নিজের শত্রুতা করে তাহা অপেক্ষা বড় শত্রুতা আর কিছুই নাই—আর মানুষ নিজের শত্রুতা করে তখন যখন সে পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। পাপের ফলে মৃত্যুর পর ভীষণ নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে, এমনকি অনন্তকাল-নরক ভোগ করিতে হইবে এ-সব লৌকিক ধর্ম্মমত কল্পনামাত্র। তবে পাপের ফলে মানুষ এই শোকদুঃখময় সাংসারিক জীবনের মধ্যে অতিশয় বদ্ধ হইয়া পড়ে, ইহা হইতে নিজেকে উদ্ধার করা কঠিন হয়—যে দিব্য শান্তিময় আনন্দময় জ্যোতির্ম্ময় জীবনলাভের জন্য মানুষ এই জগতে আসিয়াছে তাহা হইতে সে অনেক দূরে পড়িয়া থাকে—ইহাই আত্মার অধোগতি বা অধঃপতন। অতএব যাহা পাপ বলিয়া মনে হইবে, দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেই হইবে। কিন্তু সংসারের যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়া, মানুষ বর্ত্তমানে যেরূপ অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে তাহাতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্পাপ জীবন যাপন করা কোন মানবের পক্ষেই সম্ভব নহে মানুষ যে পাপ করে তাহার জন্য সে নিজে যতখানি দায়ী তাহা

অপেক্ষা যে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করে তাহা অধিক দায়ী—অথচ সমাজ পাপী ব্যক্তিকে শাসন করিতে অতি ব্যগ্র। ইহাতে কি ব্যক্তি, কি সমাজ কাহারও কল্যাণ হয় না। ব্যক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িলে, সেই সঙ্গে সমাজও অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিচার লইয়া সমাজ চলে না, অন্ততঃ এতদিন চলে নাই—তাই সামাজিক মানুষের দুঃখ তাপ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। আশা করা যায় এতদিনের অভিজ্ঞতার পর সমাজ আর নিজেই নিজের শত্রুতা করিবে না, সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিসকলকে সহানুভূতির সহিত দেখিয়া তাহাদিগকে পাপ ও ভ্রান্তি হইতে নিজ চেষ্টায় উঠিতে সাহায্য করিবে। পাপীকে নিজের চেষ্টাতেই নিজেকে সংশোধন করিতে হইবে, সমাজ বা অন্য কোন ব্যক্তি বা শক্তি কোন মানুষকে জোর করিয়া ভাল বা পুণ্যবান করিতে পারে না।

অনেক ধর্ম্মেই পাপীকে অনুতাপ করিতে বলা হয়, পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলা হয়—কিন্তু এ-সবের দ্বারা আত্মার শুদ্ধি কতটা সংসাধিত হয় তাহা সংশয়ের বিষয়। পাপকর্ম্মের জন্য সকলেরই দুঃখিত হওয়া উচিত, নতুবা পাপী নিজেকে সংশোধন করিতে অগ্রসর হইবে না, এই হিসাবে অনুতাপের সার্থকতা আছে। কিন্তু ইহার মাত্রা বাড়াইলে আত্মাকে অবসন্ন করা হয়। আমি মহাপাপ করিয়াছি, আমি অধম, আমাকে কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ ভাবনা অবসাদ আনয়ন করে। মানুষ নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হারায়, এইভাবে নিজেই নিজের উদ্ধারের পথ বন্ধ করে। এই হিসাবে যে-ধর্ম্ম পাপ ও অনুতাপের উপরেই অধিক জোর দেয়, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া তাহা মানুষের পক্ষে অনুকূল নহে। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে?···খৃষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে ব'ল্লুম। তাতে কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'! তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপী'। যে-ব্যক্তি রাত দিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই, কি! আমি তাঁর নাম করেছি আমার এখনও পাপ থাকবে? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি?···ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়, কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এইসব কথা কেন?" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ পৃঃ ৫৩)। গীতা যে বলিয়াছে ঊর্দ্ধতর আত্মার সাহায্যে নিম্নতর আত্মার

উদ্ধার সাধন করিবে, শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলিতে তাহা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

অনেকে আবার শুধু অনুতাপ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, দেহকে নানারূপ পীড়ন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাকেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপায় বলিয়া গ্রহণ করে। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মেও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে—কিন্তু এ-সব হইতেছে বস্তুতঃ লৌকিক আচার, ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কিছুই নাই—বরং ইহার দ্বারা শরীর মন অবসন্ন হইতে পারে এবং তাহাতে নিজেই নিজের শত্রুতা সাধন করা হয়। যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া সমস্ত মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্রীষ্টানগণ শরীরকে কষ্ট দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। এমন কি চলিত ভাষায় অনুবাদিত বাইবেল পাঠ করা রূপ "মহাপাপের" প্রায়শ্চিত্তের জন্য মধ্যযুগে তাহারা বহু নর-নারীকে জীবন্ত দগ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ধর্ম্মের নামে জগতে এইরূপ যে কত অত্যাচার হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আধুনিক যুগে এইরূপ অত্যাচার কম হইলেও এখনও মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেক অত্যাচার করিতেছে এবং অজ্ঞানের বশে সমাজও তাহা সমর্থন করিতেছে। অপরের বা নিজের ভুল ভ্রান্তি পাপের জন্য দেহকে পীড়ন করা এখনও সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহার পদ্ধতি হইতেছে অনশনের দ্বারা দেহকে কষ্ট দেওয়া, তাঁহার মতে ইহার দ্বারা নিজের ও অপরের শুদ্ধি সাধন করা হয়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"Crucify the flesh by fasting"—"অনশনের দ্বারা শরীরকে ক্রুশবিদ্ধ কর অর্থাৎ যন্ত্রণা দাও।" ঐ Crucify কথাটি হইতেই প্রমাণিত হয় যে এ বিষয়ে তিনি যীশুখ্রীষ্টের আদর্শ অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাও খ্রীষ্টধর্ম্মের বিকৃতি বলিয়াই মনে হয়, কারণ যীশু নিজে ইচ্ছা করিয়া ক্রুশে বিদ্ধ হন নাই। আর বস্তুতঃ যীশু বলিয়া কোন ব্যক্তি কখনও ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন সে-বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। সমস্ত জিনিষটাই একটা অধ্যাত্ম জীবনের রূপক হইতে পারে। নিম্নতন প্রকৃতির কাম-ক্রোধাদিকে নির্জ্জিত করিয়াই আমরা অধ্যাত্ম-জীবন লাভের যোগ্যতা লাভ করি—Crucifixion তাহারই স্থূল রূপক মাত্র।

হিন্দুধর্ম্মেও প্রায়শ্চিত্ত প্রথা প্রচলিত আছে—কিন্তু গীতা এই সব লৌকিক ধর্ম্মাচরণকে সমর্থন করে নাই, ধর্ম্মের মধ্যে যে নানা গ্লানি প্রবেশ করে গীতা তাহা স্পষ্ট বলিয়াছে—এবং সেই গ্লানি দূর করিয়া সত্য পন্থা দেখাইয়া দিতে ভগবানকে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য শরীরকে পীড়ন করা

এইরূপই একটি গ্লানি, ইহাতে আত্মাকে অবসন্ন করা হয় (১৭।৬)। বস্তুতঃ পাপের জন্য আমাদের এই দেহটা দায়ী নহে, পাপের জন্য দায়ী হইতেছে আমাদের অশুদ্ধ প্রাণ; অতএব দেহকে শাস্তি দিলে রামের অপরোধে শ্যামকে শাস্তি দেওয়া হয়। আর শাস্তি দেওয়াও সংশোধনের প্রকৃত পন্থা নহে, মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া, তাহার মধ্যে উচ্চতর প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াই মানুষকে পাপ হইতে মুক্ত হইতে প্রকৃত ভাবে সাহায্য করা হয়। গীতা পাপীকে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলে নাই, কেবল একান্তভাবে ভগবানের শরণ লইতে বলিয়াছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৯।৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৯।৩১

"অতিশয় দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে কারণ সে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত যথার্থ সাধনার পথ ধরিয়াছে। এরূপ ব্যক্তি অতি শীঘ্র পুণ্যাত্মা হইয়া উঠে এবং শাশ্বত শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার যে ভক্ত সে কখনই বিনষ্ট হইবে না, ইহা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াই বলিতেছি।"

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

অন্বয়। জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ।

অনুবাদ। আত্মজয়ী প্রশান্ত ব্যক্তির পরমাত্মা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ অথবা মান-অপমানে সমাহিত থাকে।

ব্যাখ্যা

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য। ইতিপূর্বে তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যোগারূঢ় ব্যক্তির শম বা শান্তিই কারণ হয়। কিসের কারণ হয় এখানে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে। উর্দ্ধতর আত্মার দ্বারা যিনি নিম্নতর আত্মাকে জয় করিয়াছেন তিনিই জিতাত্মা। নিম্নতর আত্মা অর্থাৎ দেহ, প্রাণ, মন লইয়া আমাদের যে প্রাকৃত সত্তাকে সাধারণতঃ মানুষ আত্মা বলিয়া মনে করে; শঙ্কর এই আত্মাকে বলিয়াছেন কার্য্যকারণাদিরূপসঙ্ঘাত আত্মা। যে-ব্যক্তি এই প্রাকৃত সত্তাকে বশীভূত করিয়াছে সে যে শান্ত অবস্থা লাভ করে সেই পূর্ণ শান্তির মধ্যে

তাহার ঊর্দ্ধতম আত্মা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়। কিন্তু শঙ্কর শুধু এই কথাটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই, তিনি এই সঙ্গে "সন্ন্যাসী" কথাটিও যোগ করিয়া বলিয়াছেন—"জিতাত্মা ও প্রসন্নচিত্ত হইলে সন্ন্যাসীর পরমাত্মা সমাহিত হয়।" অর্থাৎ সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ না করিলে কেহই এই উচ্চ অধ্যাত্ম অবস্থা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু গীতা এখানে আভ্যন্তরীণ শান্তির উপরেই জোর দিয়াছে, বাহ্যতঃ কর্ম্মত্যাগের কোন কথাই এখানে নাই। নিম্নতন প্রকৃতি বশীভূত হওয়ায় অন্তর হইতে যখন সমস্ত বাসনা কামনা রাগদ্বেষ দূর হইয়াছে, তখন যে আভ্যন্তরীণ শান্তভাব লাভ করা যায়, মুক্ত যোগীপুরুষের সমস্ত কর্ম্ম সেই শান্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়। এই যে শান্তি ইহা অতি গভীর, পূর্ণ,—কর্ম্ম করা না করার ন্যায় কোন বাহ্য ব্যাপারের দ্বারা ইহা ক্ষুণ্ণ হয় না। এই শান্তিই হইতেছে অধ্যাত্ম-জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি। ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মসংযম অভ্যাস করিলে আমাদেব মধ্যে এই শান্ত প্রতিষ্ঠা গড়িয়া উঠে, আমরা প্রকৃতির ঊর্দ্ধে আমাদের অধ্যাত্ম সত্তার সন্ধান পাই।

মানুষের সাংসারিক জীবন এখন যে-ভাবে চলিতেছে, সর্ব্বত্র যেরূপ দ্বন্দ্ব, অশান্তি, কোলাহল—ইহার মধ্যে থাকিয়া অধ্যাত্মজীবনের উপযোগী শান্তভাব রক্ষা করা সম্ভব নহে—এই জন্যই ভারতে পুরাকালে নির্জ্জন স্থানে আশ্রম রচনা করিয়া অধ্যাত্ম সাধনা করিবার ব্যবস্থা ছিল। গীতা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়ার উপদেশ দেয় নাই, অধ্যাত্ম চৈতন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে। তবে এই প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিবার জন্য সাময়িকভাবে যে নির্জ্জনে থাকিয়া তপস্যা করা প্রয়োজন হইতে পারে গীতা তাহা স্বীকার করিয়াছে এবং এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে তাহারই উপদেশ দিয়াছে এবং এজন্য অনেকটা রাজযোগের প্রণালীই অনুসরণ করিয়াছে। অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে হইলে ঠিক এই পন্থাই যে অবলম্বন করিতে হইবে, অথবা সংসার ছাড়িয়া নির্জ্জনে বসিয়া আসন প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে তাহা নহে। তবে যেখানে থাকিয়াই সাধনা করি, এমন অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রয়োজন যেন সাধনজীবন গড়িতে না গড়িতে বাহিরের চাপে ভাঙ্গিয়া না যায়, এবং এমন শান্ত ও সৌন্দর্য্যময় পরিবেশ থাকে যাহাতে মানুষ নিম্নপ্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সকলকে শান্তভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেগুলিকে ধীরে ধীরে নির্ম্মূল করিয়া দিতে পারে। ইহার জন্য যেমন শান্ত, পবিত্র, সৌন্দর্য্যময় পরিবেশ প্রয়োজন, তেমনই যোগ্য দিশারী ও গুরু প্রয়োজন। যে-মানুষ নিজেকে এইরূপ অনুকূল অবস্থার মধ্যে আনিয়া আত্মার সন্ধানে, অধ্যাত্ম জীবনলাভের সাধনায় প্রবৃত্ত

হয়, সেই প্রকৃতপক্ষে নিজে নিজের বন্ধু। আর যে অজ্ঞান অহং ও বাসনা-কামনার বশে সংসারের তুচ্ছ ভোগ সুখের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া রাখে সে নিজেই নিজের শত্রুতা করে। যতক্ষণ না তাহার এই নেশা ছুটিতেছে ততক্ষণ তাহার মুক্তি বা উদ্ধারের কোন আশাই নাই।

পরমাত্মা সমাহিতঃ। "পরমাত্মা সমাহিত হয়," এই কথাটির ব্যাখ্যায় অনেক প্রকার মতভেদ দেখা যায়। শঙ্কর বলিয়াছেন, জিতাত্মা ও প্রসন্নচিত্ত হইলে সন্ন্যাসীর পরমাত্মা সমাহিত হয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্মভাবে প্রকাশ পায়, সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শঙ্কর আত্মা ও পরমাত্মা এই দুইয়ের মধ্যে, কোন প্রভেদ করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় অদ্বৈতবাদীরা এরূপ প্রভেদ করেন না, তাঁহাদের মতে আত্মা যখন প্রকৃতি বা মায়াতে বদ্ধ তখনই সে জীব; এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই সে পরমাত্মা হইয়া যায়। বস্তুতঃ তাহার যে কোন পরিবর্ত্তন হয় তাহা নহে, আত্মা যেমন ছিল তেমনই থাকে, তবে এক অবস্থায় তাহাকে জীব বা আত্মা বলা হয়, অন্য অবস্থায় তাহাকেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হয়। মহাভারতে অন্যত্র বলা হইয়াছে,

আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্ত সংযুক্ত প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব তু বিনির্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ॥
—শান্তিপর্ব্ব ৮৭।২৪

আত্মা ও পরমাত্মা যে মূলতঃ একই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তথাপি গীতা এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ করিয়াছে সেটি মনে না রাখিলে গীতার অদ্বৈত মতটি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শরীরের সঙ্গে, প্রকৃতির গুণসকলের সঙ্গে সংযুক্ত হইলেই যে আত্মা বদ্ধ হয় গীতা তাহা স্বীকার করে না—

অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ১৩।৩১

মানুষ মুক্তই হউক আর বদ্ধই হউক, জ্ঞানীই হউক আর অজ্ঞানই হউক তাহার মধ্যে যে অক্ষর পুরুষ রহিয়াছে তাহা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অপরিবর্ত্তনীয়, প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে থাকিয়াও তাহার সকল ক্রিয়ার ঊর্দ্ধে থাকে অর্থাৎ সে-সব তাহাকে বিচলিত করে না, তাহা কূটস্থ। এই আত্মা বা পুরুষ প্রকৃতির ঊর্দ্ধে বলিয়াই গীতা ইহাকে "পরং" বলিয়াছে, পরমাত্মা বলিয়াছে (৩।৪২,৪৩)। কিন্তু অজ্ঞান মানুষ তাহার অন্তরস্থিত এই পরমাত্মাকে জানে না, সে নিজেকে প্রকৃতির ক্রিয়াসকলের সহিত এক করিয়া দেখে, সেই সবে আসক্ত হয়—সাধারণতঃ আত্মা বলিতে প্রকৃতির গুণে আসক্ত

পুরুষকেই বুঝায়—তাই গীতা এখানে প্রকৃত আত্মাকে বুঝাইতে পরমাত্মা শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ২১ ও ২২ শ্লোকে গীতা এই প্রভেদটি সুস্পষ্ট করিয়াছে।

আমাদের মধ্যে এই যে অক্ষর পুরুষ পরমাত্মা রহিয়াছে—প্রকৃতিতে আসক্তির বশে আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না। আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া হৃদয় মনকে সমস্ত বাসনা কামনা আসক্তি হইতে মুক্ত করিলে আমরা যে শান্তভাব লাভ করি তাহাতে এই পরমাত্মা আমাদের বাহ্য চৈতন্যে প্রকাশিত হয়, আমরা তাহার অচল, অব্যয়, গুণাতীত, অক্ষর স্বরূপ উপলব্ধি করি এবং তাহার সহিত তাদাত্ম্যের ফলে আমরা আমাদের বাহ্য চৈতন্যেও সেইরূপ অচল, অটল, নির্ব্বিকার হইয়া উঠি—পরমাত্মা সমাহিত হয় বলিতে গীতা ইহাই বুঝিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীতার অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার শঙ্করের অনুসরণ করিয়া আত্মা ও পরমাত্মার কোন প্রভেদ স্বীকার করেন নাই, তবে "পরং" বিশেষণটি কেন যোগ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়। শ্রীধর বলিয়াছেন, যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে পরমাত্মা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়—এই ব্যাখ্যা সমীচীন। আত্মা সকল সময়ে আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহাকে জানি না, আমাদের বাহ্য চৈতন্যে আমরা সেই আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞান। কিন্তু আত্মসংযম ও শান্তভাব অভ্যাস করিলে আমাদের বাহ্য চৈতন্যেও আমরা আত্মার সহিত যুক্ত থাকিতে পারি (৬।৮)। এ-ব্যাখ্যা ঠিক, কিন্তু পরং বিশেষণটি কেন ব্যবহার করা হইল? কেহ কেহ "পরং" ও "আত্মা" এই দুইটি পদকে পৃথক করিয়া 'পরং'কে সমাহিতের ক্রিয়াবিশেষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা নীলকণ্ঠ—পরমুৎকর্ষেণ সমাহিতঃ সমাধিপ্রাপ্তো ভবতি অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে সমাহিত হয়। তিলক বলিয়াছেন, "এই অর্থ ক্লিষ্ট; কিন্তু এই উদাহরণের দ্বারা বুঝা যাইবে যে, সাম্প্রদায়িক টীকাকার নিজের মতানুসারে গীতার কি প্রকার টানাবুনো করেন।" আমরা উপরে যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহাতেই এই "পরং" বিশেষণটির সার্থকতা সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়। আমাদের মধ্যে দুইটি আত্মা বা সত্তা রহিয়াছে, একটি অধ্যাত্ম সত্তা, একটি প্রাকৃত সত্তা। দেহ, প্রাণ, মন লইয়া আমাদের প্রাকৃত সত্তা; অধ্যাত্ম সত্তা ইহাদের ঊর্দ্ধে, তাহা বুঝাইবার জন্যই এখানে 'পরং' বিশেষণটি ব্যবহার করা হইয়াছে। কেশবাচার্য্য এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পরমাত্মা অর্থাৎ মন বুদ্ধি আদি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ আত্মা।" "জিতাত্মা" কথাটির মধ্যে যে "আত্মাকে" বুঝান হইয়াছে তাহা হইতেছে আমাদের নিম্নতর আত্মা, অহংকে কেন্দ্র করিয়া দেহ,

প্রাণ, মন, বুদ্ধি লইয়া আমাদের মধ্যে যে আত্মভাব সৃষ্ট হইয়াছে সেই প্রাকৃত আত্মা। ঊর্দ্ধতর আত্মার দ্বারা নিম্নতর আত্মাকে জয় করিতে হইবে, অধ্যাত্ম সত্তার দ্বারা প্রাকৃত সত্তাকে জয় করিতে হইবে—ইহাই মানুষের পূর্ণতা ও মুক্তিলাভের পন্থা। যাহারা এই ঊর্দ্ধতর আত্মার সন্ধান পায় নাই, তাহারা চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহারাই পূর্ব্বশ্লোকে "অনাত্মা" শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে; পঞ্চদশ অধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে এইরূপ ব্যক্তিকে অকৃতাত্মা বলা হইয়াছে; এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে তাহাদের নিম্নতর আত্মা, তাহাদের প্রাকৃত সত্তা তাহাদের শত্রুবৎ হয় এবং অহিত সাধন করে।

গীতা এই শ্লোকে (এবং ১৩।৩১ শ্লোকে) পরমাত্মা বলিতে প্রকৃতির ঊর্দ্ধে অবস্থিত অক্ষর পুরুষকে বুঝিয়াছে। ক্ষর পুরুষ প্রকৃতির সহিত এক, প্রকৃতির খেলায় নিমগ্ন—আমরা যে শুধুই ক্ষর নহি, আমাদের মধ্যে অক্ষর পুরুষ রহিয়াছে এই জ্ঞান লাভ করা, অক্ষরের শান্ত কূটস্থ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, ইহাই মুক্তিলাভের পন্থা। কিন্তু এই অক্ষর পুরুষেরও ঊর্দ্ধে রহিয়াছেন পুরুষোত্তম, গীতা অন্যত্র তাঁহাকেও পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে (১৩।২২; ১৫।২৭)। ইহাতে কোনই বিরোধ হয় নাই, কারণ ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম এই তিনই ভগবান, ইহারা একই ভগবানের তিনটি ভাব (status)—ইহাদের মধ্যে ক্ষর হইতেছে প্রকৃতির লীলায় নিমগ্ন, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম সেই খেলার ঊর্দ্ধে, তাই অক্ষর পুরুষকে এবং পুরুষোত্তমকে পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

"সমাহিত" কথাটির অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। শঙ্কর বলিয়াছেন, সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ—অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্মভাবে প্রকাশ পায়; কিন্তু শুধু "প্রকাশ পায়" বলিলে "সমাহিত" কথাটির সম্যক অর্থ প্রকাশিত হয় না। শ্রীধর ও তিলক বলিয়াছেন, পরমাত্মা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে সমাহিত অর্থাৎ সম ও স্থির থাকে। কিন্তু পরমাত্মা ত সকল সময়ে সর্ব্বত্রই সম ও স্থির থাকে, তাহা হইতেছে কূটস্থং অচলং ধ্রুবং, অতএব "স্থিতো ভবতি," স্থির হয়—এরূপ ব্যাখ্যা করা চলে না। সম্যক ধারণাযোগ্য হয়, অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়, সুখে থাকে, সমাধির বিষয় হয়, স্বরূপে অবস্থিত হয়, সমাধি প্রাপ্ত হয়—এইরূপ অন্যান্য ব্যাখ্যা দেখা যায়। বস্তুতঃ পরমাত্মা সকল সময়েই স্বরূপে অবস্থিত, সমাধিস্থ; এবং তাহা সর্ব্বভূতের মধ্যেই অন্তরাত্মারূপে বিরাজ করিতেছে,

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥
—শ্বেতাশ্বতর ৬।১১

কিন্তু আমাদের গোপনহৃদয়বাসী এই দেবতাকে আমরা জানি না চিনি না, ইনি আমাদের বাহ্য চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত নন, আমাদের বাহ্য চৈতন্যের যাহা কেন্দ্রস্বরূপ আত্মা তাহা হইতেছে অহং, তাহা এই অন্তরাত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা বাহ্য চৈতন্যে ঐ অন্তরাত্মারই ছায়া বা আভাস। যখন ঐ পরমাত্মা বা অন্তরাত্মা আমাদের অহংয়ের স্থান গ্রহণ করে, আমাদের বাহ্য চৈতন্যেরও কেন্দ্র হয়, আমাদের বহিরাত্মা অহং তাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যায় তখনই বলা যায় যে পরমাত্মা আমাদের বাহ্য চৈতন্যেও সমাহিত অর্থাৎ সম্যকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যেমন আভ্যন্তরীণ চৈতন্যে তেমনিই বাহিরের সকল দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভের মধ্যেও আপনাতে আপনি সমাহিত বা সমাধিস্থ রহিয়াছে।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু। শীত-উষ্ণ, সুখদুঃখ, মান-অপমান—এই সব দ্বন্দ্ব লইয়াই আমাদের সাধারণ জীবন। শীত-উষ্ণ দেহের দ্বন্দ্ব, সুখ-দুঃখ প্রাণের দ্বন্দ্ব, মান-অপমান মনের দ্বন্দ্ব—এইরূপ দ্বন্দ্বসকলের দ্বারা আমাদের বাহ্য চৈতন্য সর্ব্বদা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাই আমরা আমাদের অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাই না, অজ্ঞান ও মোহের মধ্যে বাস করিয়া অশেষ দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করি,

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ৭।২৭

কিন্তু এই সব দ্বন্দ্ব আমাদের অন্তরাত্মাকে, পরমাত্মাকে স্পর্শ করে না, তাহা সকল সময়েই আপনার অচল অটল শান্তি ও আত্মানন্দে পূর্ণ, প্রসন্ন, প্রশান্ত। আমাদের বাহ্য চৈতন্যে এই আত্মার ধ্যান করিয়া যদি আমরা শান্তভাব অভ্যাস করি তাহা হইলে ঐ আত্মাই হইয়া উঠে আমাদের জীবনের কেন্দ্র, তখন আমরা বাহ্য চৈতন্যে, বাহ্য জীবনেও উহারই ন্যায় প্রশান্ত হইয়া উঠি। তখন আর আমাদের রাগ বা দ্বেষ থাকে না, বাসনা কামনা থাকে না—সর্ব্বত্র পূর্ণ সমভাবই হয় আমাদের চৈতন্যের স্বরূপ। এই পূর্ণ সমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবন যাপন করা, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করা ইহাই গীতার যোগের মর্ম্ম, কর্ম্মযোগীর আদর্শ।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯

অন্বয়। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে।

সুহৃৎ-মিত্র-অরি-উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু সাধুষু অপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে।

অনুবাদ। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্ব্বিকার, অচঞ্চল, জিতেন্দ্রিয়, মৃৎপিণ্ড ও সুবর্ণে যাঁহার সমদৃষ্টি, ঈদৃশ যোগীপুরুষকেই যুক্ত বলা হয়।

সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষযোগ্য, বন্ধু—এই সকলের প্রতি, এমনকি সাধু ও পাপীর প্রতি যাঁহার সমবুদ্ধি তিনিই উত্তম।

ব্যাখ্যা

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা। গীতা এখানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রভেদ করিয়াছে। শঙ্করের অনুসরণ করিয়া অন্যান্য প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই বলিয়াছেন, জ্ঞান শব্দের অর্থ শাস্ত্রীয় বিষয় সমূহের পরিজ্ঞান, আর বিজ্ঞান শব্দের অর্থ শাস্ত্রের দ্বারা পরিজ্ঞাত সেই পদার্থ সমূহকে সেইভাবে নিজের অনুভবের বিষয় করা। মধুসূদন সরস্বতী এইটিই আরও বিশদ করিয়াছেন—"জ্ঞান, অর্থাৎ শাস্ত্রে যে সমস্ত পদার্থের বিষয় বলা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে ঔপদেশিক অর্থাৎ উপদেশশ্রবণজন্য পরোক্ষ জ্ঞান, আর বিজ্ঞান অর্থ যেরূপ বিচার করিলে সেই শাস্ত্রীয় উপদেশশ্রবণজন্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপর যে অপ্রামাণ্য শঙ্কা তাহার যাহাতে নিরাকরণ হইয়া থাকে সেইরূপ বিচার করিয়া নিজ অনুভব দ্বারা সেইগুলির সেই প্রকার স্বরূপের যে অপরোক্ষ করা তাহাই বুঝায়।" কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে স্বানুভবসিদ্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান বুঝাইতে "জ্ঞান" শব্দই ব্যবহৃত হয়, অন্য যে জ্ঞান তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহা অজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। গীতাও বলিয়াছে,

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১৩।১১

বস্তুতঃ গীতা সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ন্যায় এখানেও "বিজ্ঞান" শব্দের দ্বারা বিশেষ জ্ঞান বুঝাইয়াছে। সে বিশেষ জ্ঞান কি? রামানুজ বলিয়াছেন, আত্মার স্বরূপ বিষয়ে যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞান, আর প্রকৃতি হইতে আত্মা পৃথক এই জ্ঞানই বিজ্ঞান। কিন্তু প্রকৃতিকে আত্মা হইতে পৃথক সত্তা বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে সাংখ্য মত, গীতা তাহা স্বীকার করে নাই, গীতার মত সাংখ্যের ন্যায় দ্বৈত নহে,

অদ্বৈত। তথাপি গীতা পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য স্বীকার করিয়াছে, তাহা মূলগত পার্থক্য নহে, কিন্তু ক্রিয়ায় ও প্রকাশে পার্থক্য। আত্মা মূল সত্তায় কি, তাহার জ্ঞানকেই গীতা এখানে জ্ঞান বলিয়াছে এবং প্রকৃতি কি, আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ কি, পুরুষ ও আত্মার সংযোগে এই জগতের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল—এই সবের বিস্তারিত জ্ঞানকেই গীতা "বিজ্ঞান" নামে অভিহিত করিয়াছে। তিলক বলিয়াছেন, "সৃষ্টিতে অনেক প্রকারের অনেক পদার্থে একই অবিনাশী পরমেশ্বর প্রবিষ্ট রহিয়াছেন—ইহা বুঝিবার নাম জ্ঞান (১৮।২০) এবং একই নিত্য পরমেশ্বর হইতে বিবিধ নশ্বর পদার্থের উৎপত্তি বুঝিয়া লওয়াকে বিজ্ঞান বলে (১৩।৩০)"। শঙ্করের ন্যায় মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ, 'আত্মা ব্রহ্ম'—এই জ্ঞানটির উপরেই জোর দিয়াছেন, কিন্তু অন্ন (দেহ) ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম—উপনিষদের এই বাক্যগুলি তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা। কিন্তু ইহা শ্রুতিব মত নহে, শ্রুতির মতে—সর্ব্বং খলু ইদম্ ব্রহ্ম, এই সবই ব্রহ্ম। গীতাও শ্রুতিকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছে—বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। এই যে জগতের সব কিছুকেই আত্মা বলিয়া, ব্রহ্ম বলিয়া, ভগবান বলিয়া জানা—গীতা ইহাকেই বিজ্ঞান বলিয়াছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের দ্বারাই যাহার চিত্ত আলোকিত হইয়াছে, সকল সংশয় দূর হইয়াছে তিনিই জীবন ও কর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছেন—এইরূপ প্রবুদ্ধ ব্যক্তিই দিব্য কর্ম্ম, দিব্য জীবনের অধিকারী, প্রকৃত কর্ম্মযোগী হইতে পারেন।

বিজ্ঞানের সহিত যে জ্ঞান তাহাই সমগ্র জ্ঞান (৭।১,২), এই জ্ঞান লাভ করিলে আর জানিতে কিছুই বাকী থাকে না, সকল সংশয়ের মীমাংসা হইয়া যায়, তাই এইরূপ জ্ঞানেই মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। এইরূপ সমগ্র জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আমাদের চৈতন্যের, আমাদের অনুভব ও অভিজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রগুলিকেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। আত্মা অচল, অক্ষর, কূটস্থ, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নিগুর্ণ—ইহা অতি উচ্চ অধ্যাত্ম অনুভূতি। কিন্তু ইহাই সব নহে, সমগ্র জ্ঞান নহে। ইহা শুধু ভগবানের অক্ষর স্বরূপের জ্ঞান—ইহা ছাড়াও ভগবানের ক্ষর রূপ আছে, তাহাই এই জগৎলীলা, এবং এই দুইয়েরই ঊর্দ্ধে তিনি পুরুষোত্তম। মায়াবাদীরা কেবল অক্ষরের জ্ঞানের উপরেই সব জোর দিয়াছেন—এইটিই তাহাদের ত্রুটি, তাহাদের ভ্রান্তি। অন্য পক্ষে জড়বাদীরা বাহ্য মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং ইহাদের বিষয়স্বরূপ জড়জগৎকেই সব সত্য বলিয়া ধরিয়াছে—ইহারাও সত্য, ইহাদিগকে বাদ দিলে সমগ্র জ্ঞান লাভ করা যায় না। কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া জগতের কোন অস্তিত্ব নাই, জড়জগৎ চৈতন্যময় ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি ও আত্ম প্রকাশ—ইহা না জানিলে

সমগ্র জ্ঞান হয় না। যেমন জগৎ সম্বন্ধে তেমনই ব্যষ্টিগত মানব সম্বন্ধে। আমাদের এই বাহ্য মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ই আমাদের সমগ্রসত্তা নহে—ইহাদের পিছনে রহিয়াছে সূক্ষ্ম মন, প্রাণ, দেহ, তাহাদেরও পিছনে রহিয়াছে আত্মা—এই আভ্যন্তরীণ সত্তাই আমাদের প্রকৃত সত্তা, ইহাকে না জানিলে আমরা নিজদিগকে সমগ্রভাবে জানিতে পারি না, আর সম্যক জ্ঞান না থাকিলে আমাদের কর্ম্ম, আমাদের জীবনও পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ সাফল্যময় হইতে পারে না। জড়বাদী বহির্মুখী পাশ্চাত্য জাতি মানব-জীবনের বাহ্য ব্যাপারের উপরেই অত্যধিক দৃষ্টি দিয়াছে, তাহারা অন্তর ও অন্তঃকরণকে তেমন সন্ধান করিয়া দেখিতে পারে নাই, তাই যেমন ভারতবাসী মায়াবাদের প্রভাবে বাহ্য জীবনকে অবহেলা করিয়া ঐহিক ব্যাপারে অকৃতকার্য্য হইয়াছে তেমনই পাশ্চাত্য জাতিও অন্তর্জীবনকে উপেক্ষা করিয়া ঐহিক জীবনকে সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত করিবার সকল চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য জাতির মনোভাবে পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে—জড়বিজ্ঞানের আশ্চর্য্যময় আবিষ্কার-সকল মানবজীবনকে দুঃখ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই দেখিয়া তাহারা অন্তর্জীবন সন্ধান করিয়া দেখিতেছে, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে মানবজীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে, এই সত্যটি তাহারা ক্ষীণভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ও জীবনের এই সমন্বয় কার্য্যতঃ কেমন করিয়া হইতে পারে, আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জন্মভূমি ভারতই জগৎকে তাহা দেখাইতে পারে—এ-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে এই মহান সমন্বয়ের সূচনা করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

"বিজ্ঞান কি না 'বিশেষরূপে জানা'…বিজ্ঞান হলে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন,—তিনি সংসার ছাড়া নন।"

"তিনিই সব হয়েছেন;—তাই বিজ্ঞানীর পক্ষে এই সংসার 'মজার কুটী', (মায়াবাদী) জ্ঞানীর পক্ষে এ সংসার ধোঁকার টাটী।"

"আমি সবই লই। তুরীয়—আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি; আমি তিন অবস্থাই লই। আমি ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে। ব্রহ্ম—জীব-জগৎ-বিশিষ্ট। প্রথম 'নেতি নেতি' করবার সময় জীব জগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। বেলের সার বল্‌তে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে, শুধু শাঁস ওজন কর্‌লে

হবে না। ওজন করবার সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ-সংসার উড়িয়ে দিই না। তাহলে যে ওজনে কম পড়্‌বে।"

কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। "কূটস্থ" শব্দটি খুবই ব্যঞ্জনাপূর্ণ ; অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে এটি একটি বীজ-মন্ত্র স্বরূপ। গীতা অক্ষর পুরুষকেই পরে কূটস্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে (১৫।১৬)। ভগবান দুইটি নিগূঢ় ভাব ও তত্ত্বে নিজেকে জগতে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, একটি ভাবে তিনি এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সব কিছুই হইয়াছেন, ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি, আর একটি ভাবে তিনি এই সবের ঊর্দ্ধে শাশ্বত শান্তি ও নীরবতার অবিকম্প অচলতায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই 'অক্ষর' ভাবটি বুঝাইতেই গীতা 'কূটস্থ' বিশেষণটি ব্যবহার করিয়াছে। আমাদের মধ্যে ভগবান এই দুই ভাবেই রহিয়াছেন—আমরা কখনও একটি, কখনও অপরটির দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হই—কখনও সংসারের বিরামহীন কর্ম্মস্রোতে, পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসিয়া চলি, আবার কখনও এ-সবকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া অক্ষরের শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল কূটস্থ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হই। পুরুষোত্তমের মধ্যে এই দুইটি ভাব একই সঙ্গে রহিয়াছে—তাঁহাকে ভক্তি করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে আমাদের সমস্ত জীবন ও কর্ম্মকে উৎসর্গ করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার সকল তত্ত্বে জানিয়া যখন আমরা তাঁহার ভাব লাভ করিব তখন আমাদের মধ্যে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই ভাবেরই সমন্বয় হইবে—আমরা সংসারের সকল কর্ম্ম, সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে থাকিয়াও ভিতরে অক্ষরের শান্ত নির্ব্বিকার অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিব। এই উচ্চতম মুক্তির অবস্থা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগকে নিম্নপ্রকৃতির বিক্ষুব্ধ ক্রিয়াসকলকে সংযত করিয়া অক্ষরের শান্তভাব লাভ করা অভ্যাস করিতে হইবে, অক্ষরের ন্যায়ই কূটস্থ হইবার সাধনা করিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত বলিতে গীতা এই কূটস্থ অবস্থাই বুঝাইয়াছে। তাঁহার বাহ্য মানসিক চৈতন্যে এবং দেহের ক্রিয়ায় সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ প্রবল বা ক্ষীণ হইতে পারে, তাহার ফলে তাঁহার মধ্যে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহের খেলা চলিতে পারে,—কিন্তু গুণাতীত ব্যক্তি ইহাদের কোনটি আসিলে বা যাইলে হর্ষান্বিত বা ব্যথিত হন না (১৪।২২), তিনি এক ঊর্দ্ধতর চৈতন্যের আলোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, উদাসীনবদাসীনো, এবং তাঁহার সেই ঊর্দ্ধতর চৈতন্য গুণসকলের ক্রিয়ার দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, ঠিক যেমন যাহারা ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়াছে, মেঘের উপর সূর্য্য

তাহাদের নিকট সদা অবিচলিতভাবে প্রকাশমান থাকে। সেই উর্দ্ধস্থিতি হইতে তিনি দেখেন যে গুণসকল আপন আপন কার্য্য করিতেছে, তাহাদের বিক্ষোভ বা বিরাম লইয়াই তাঁহার নিজ সত্তা নহে, সে-সব হইতেছে কেবল প্রকৃতির খেলা। তাঁহার অধ্যাত্ম সত্তা এই সবের উর্দ্ধে অবিচলিত থাকে, তাহা অনিত্য বস্তুসকলের নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দেয় না (১৪।২৩), এইটি হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতির নির্ব্যক্তিক ভাব, কারণ ঐ উর্দ্ধতর তত্ত্ব, ঐ মহত্তর উদার উদাসীন চৈতন্য—উহাই অক্ষর ব্রহ্ম। কূটস্থ শব্দের দ্বারা এই অক্ষর ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন।

"কূট" শব্দের একটী অর্থ হইতেছে আকাশ, অতএব কূটস্থ শব্দের দ্বারা এই অক্ষর ব্রাহ্মীস্থিতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কূটে আকাশে স্থিতা কূটস্থা। "আকাশে সংস্থিতা স্বেষা ততঃ কূটস্থিতা মতা"—ঋগ্বেদ। কূট শব্দের আর একটি অর্থ লৌহপিণ্ড বিশেষ, যাহার উপর হাতুড়ীর ঘা মারা হয়, কিন্তু তাহাতেও তাহা অবিচলিত থাকে। অতএব ব্রাহ্মীস্থিতির অবিকম্প নির্ব্বিকার ভাবটিও কূটস্থ শব্দের দ্বারা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কূটস্থ ব্যক্তি প্রকৃতির সকল ক্রিয়ার উর্দ্ধে ব্রহ্ম-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রকৃতির মধ্যে বিষয় সন্নিধানে থাকিয়াও তাঁহার কোনরূপ বিকার বা চাঞ্চল্য হয় না। এই জন্যই তিনি আবার জিতেন্দ্রিয়। বিজিতেন্দ্রিয় বলিতে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, বিষয়গ্রহণে নিবৃত্ত, কিন্তু বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় জয় বলিতে এইরূপ বাহ্যত্যাগ বুঝায় না। যে-ব্যক্তি বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণে বিচলিত হন না, ইন্দ্রিয়গণকে যথেচ্ছ পরিচালিত করিতে পারেন, ইচ্ছামত সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে টানিয়া লইতে পারেন তিনিই জিতেন্দ্রিয়। জ্ঞানলাভের দ্বারা রাগ ও দ্বেষ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া পূর্ণ সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত ভাবে ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়া যায় (২।৬৪)। জ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপ কূটস্থ ও বিজিতেন্দ্রিয় হন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"দুটি জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম, কূটস্থ-বুদ্ধি। হাজার দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, বিঘ্ন হোক্—নির্ব্বিকার, যেমন কামারশালের লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর দ্বিতীয়, পুরুষকার,—খুব রোখ্। কাম ক্রোধে আমার অনিষ্ট কর্‌ছে তো একেবারে ত্যাগ। কচ্ছপ যদি হাত পা একবার ভিতরে সাঁদ করে, চারখানা করে কাট্‌লেও আর বার কর্‌বে না।"

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী। আমাদের প্রাকৃত সত্তার সকল বিক্ষোভ ও পরিবর্ত্তনের উর্দ্ধে যে অক্ষর পরমাত্মা কূটস্থ রহিয়াছেন, যোগী যখন তাঁহারই ন্যায় কূটস্থ হয়, সকল বাহ্যদৃশ্য ও পরিবর্ত্তনের উর্দ্ধে উঠে, আত্ম-জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হয়, সকল বস্তু ও ব্যক্তি ও

ঘটনায় প্রতি সমবুদ্ধি সম্পন্ন হয় তখনই তাহাকে যুক্ত বলা যায়। যোগী শব্দে এখানে বুঝিতে হইবে যিনি যোগ সাধনা করিতেছেন, পরবর্ত্তী দশম শ্লোকেও যোগী শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর "যুক্ত" শব্দে বুঝিতে হইবে যখন তিনি যোগে সিদ্ধ হইয়াছেন, যোগারূঢ় হইয়াছেন, ঊর্দ্ধে পরমাত্মা ও ভগবানের সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হইয়াছেন। গীতা অন্যত্র "যুক্ত" শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছে (২।৬১ ; ৪।১৮ ; ৫।২১,২৩)। তবে এখানে অক্ষর পুরুষের সহিতই যোগের কথা বলা হইয়াছে, ইহা খুবই উচ্চ অবস্থা হইলেও উচ্চতম অবস্থা নহে, উচ্চতম অবস্থা তখনই হয় যখন যোগী অক্ষরেরও ঊর্দ্ধে পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হন। এই অধ্যায়ের শেষে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে গীতা এই পুরুষোত্তমের সহিত যোগকেই "যুক্ততম" শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছে। অক্ষরের সহিত যোগের ফলে আইসে অবিচল শান্তি, প্রকৃতির সকল বিক্ষোভ হইতে মুক্তি, এবং পূর্ণতম সমতা। কিন্তু ইহাই দিব্য অধ্যাত্ম জীবন নহে, পূর্ণতম সিদ্ধির অবস্থা নহে। পুরুষোত্তমের প্রতি প্রেম ও ভক্তি দ্বারা সকল কর্ম্ম, সকল জীবন সজ্ঞানে তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াই এই উচ্চতম সিদ্ধির অবস্থা লাভ করা যায় এবং এইটিই গীতার উচ্চতম শিক্ষা, পরম রহস্য। এই অবস্থায় যোগী শুধু আত্মাতেই ভগবানের সহিত এক হইয়া থাকেন না, তাঁহার প্রকৃতিও ভাগবত প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। তিনি তখনও আত্মাকে দেখেন শাশ্বত, অক্ষর, কূটস্থ, কিন্তু তিনি তখন প্রকৃতিকেও আত্মারই শক্তি, ভগবানেরই অভিব্যক্তি বলিয়া দেখেন। তিনি দেখেন, এই যে আমাদের ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতি, ইহাই সব নহে—ইহারও ঊর্দ্ধে রহিয়াছে পরা অধ্যাত্ম প্রকৃতি, আমাদের দেহ, প্রাণ মনে যাহা এখন অপূর্ণভাবে, খণ্ডভাবে বিকৃতভাবে প্রকট হইতেছে সেই সবের সত্য ঐ পরা প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, এখনও প্রকট হয় নাই। এই পরা প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়াই যোগী সকল অহংভাব হইতে মুক্ত হন, নিজেকে সর্ব্বভূতের সহিত মূলতঃ এক বলিয়া অনুভব করেন এবং তাঁহার কর্ম্মময় বাহ্য প্রকৃতিতেও নিজেকে বিশ্বাতীত অনন্ত ভগবানেরই একটি শক্তি বলিয়া অনুভব করেন। তিনি সব কিছুকেই ভগবানের মধ্যে দেখেন, ভগবানকে সব কিছুর মধ্যে দেখেন। নিম্ন প্রকৃতির সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে, আশা নিরাশা হইতে পাপ পুণ্য হইতে মুক্ত হন। তাহার পর তাঁহার জাগ্রত দৃষ্টি ও অনুভবের সম্মুখে সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছা, ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া প্রতিভাত হয়। বিশ্বচৈতন্য ও শক্তির একটি সত্তা ও অংশরূপে তিনি জীবন যাপন করেন ; তিনি বিশ্বাতীত দিব্য পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকেন।

সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। গীতা যেমন অন্যত্র তেমনি এখানেও সমতাকেই যোগের বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়াছে। সাধরণতঃ লোক বাহ্য লক্ষণ দেখিয়াই যোগী অধ্যাত্মপুরুষের বিচার করে—কৌপীন পরিধান, স্বল্পাহার, শারীরিক কৃচ্ছ্রতা সাধন, বাহ্য বিষয় ত্যাগ এই সব দেখিয়াই আধ্যাত্মিকতা নির্ণয় করিতে চায়। কিন্তু ইহা ভ্রান্তি, অজ্ঞান। যাঁহার চৈতন্যের প্রসারতা হইয়াছে, মন বুদ্ধির ঊর্দ্ধে অবস্থিত আত্মার সহিত যিনি যুক্ত হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত অধ্যাত্ম পুরুষ, তাঁহার সকল লক্ষণই অভ্যন্তরীণ, প্রসারিত উন্নীত চৈতন্যের জ্ঞাপক এবং সমতা হইতেছে এই অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের বিশিষ্ট লক্ষণ। এই শ্লোকে গীতা যুক্ত পুরুষের যে-সব বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি হইতেছে পরবর্ত্তী বিশেষণটির কারণ স্বরূপ—এইরূপ ব্যাখ্যা অনেকেই করিয়াছেন। যথা শ্রীধর বলিয়াছেন—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা অতএব কূটস্থ (নির্ব্বিকার), অতএব বিজিতেন্দ্রিয়, অতএব সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন। কিন্তু এই সকল অবস্থাই পরস্পরসাপেক্ষ—একটিতে অপূর্ণতা থাকিলে অন্যগুলি পূর্ণ হয় না, যখন জ্ঞান, নির্ব্বিকারতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সমতা সবগুলিই সম্পূর্ণ ভাবে সিদ্ধ হয় তখনই সেই যোগীকে যুক্ত বা যোগারূঢ় বলা যায়।

গীতা অন্যত্র সমতাকেই যোগ বলিয়াছে, সমত্বং যোগ উচ্যতে (২।৪৮)। এখানেও বলা হইল যে, মাটি, পাথর ও সুবর্ণে যাহার সমান জ্ঞান তাহাকেই যুক্ত বলা যায়। গীতা পুনঃ পুনঃ সমতার উপরে জোর দিয়াছে (২।১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। যে উদার ও গভীর সমতা গীতার লক্ষ্য তাহা একেবারেই লাভ করা যায় না, সেজন্য গুণত্রয়ের অতীত হইয়া কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় (১৪।২২-২৫)। প্রথম প্রথম সাত্ত্বিক বুদ্ধির বিচারের দ্বারা সমতা অভ্যাস করা যায়। কামিনী কাঞ্চনের প্রতি মানুষের তীব্র আসক্তি, উহারা ঈশ্বর হইতে মানুষকে বিমুখ করে, সেদিকে যাইতে দেয় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া এই সবের প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করিতে বলিতেন ঃ—"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বস্তু। তাই টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। এর নাম বিচার। আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে? বিচার কর। সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্ব্বি, মল, মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভূলে যায়?"

ঈশ্বর কি, জগৎ কি, মানুষ কি, মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি—এ-সব সম্বন্ধে দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিয়া সাত্ত্বিক বুদ্ধির বিচারের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়, সমতা অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু আত্মাকে লাভ না করিলে, ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে

কখনই এ-সব পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। আবার আত্মাকে জানিতে হইলে অন্তর্মুখী হইতে হয়—ইন্দ্রিয়বেগ সংযত করিতে হয়, সকল জিনিষ সকল ঘটনার প্রতি সমভাব অভ্যাস করিতে হয়। যেমন জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় তেমনই সমতাও সুদৃঢ় হয়, আবার যেমন সমতা বর্দ্ধিত হয় তেমনই ইন্দ্রিয়সংযমে অধিকতর সাফল্য লাভ করা যায়, অধিকতর অন্তর্মুখী হওয়া যায়, এইভাবে আত্ম-জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়। সমতা অভ্যাসের দ্বারা আমরা আমাদের মধ্যে যে সমম্ ব্রহ্ম, অক্ষর পুরুষ রহিয়াছেন তাহার আভাস পাই, আবার সেই ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে সমতা, ইন্দ্রিয়জয় এই সবই পূর্ণতা লাভ করে। অতএব জ্ঞান, নির্ব্বিকারতা, ইন্দ্রিয়জয়, সমতা এ-সবই পরস্পরসাপেক্ষ, একই সঙ্গে এই সবেরই সাধনা করিতে হয়, যথাকালে একের পূর্ণতাতে অন্যগুলিও পূর্ণ হইয়া উঠে।

গীতা মাটি ও সোনাকে সমান দেখিতে বলিয়াছে, কাঞ্চনকে, অর্থকে ত্যাগ করিতে বলে নাই, অধ্যাত্ম শাস্ত্র হিসাবে এইটিই গীতার বৈশিষ্ট্য। অনেক অধ্যাত্ম সাধনা আছে, তাহাতে বলা হয়, অর্থম্ অনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্, অর্থই সকল অনর্থের মূল, অর্থ বর্জ্জন করিয়া দরিদ্র ও নগ্নের জীবন যাপন করাই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।* কিন্তু এটা ভুল। বস্তুতঃ অর্থ হইতেছে একটি বিশ্বশক্তির প্রতীক, বাহ্যজীবনকে পূর্ণভাবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে গঠন করিবার জন্য এই শক্তি অপরিহার্য্য। এই শক্তি মুলতঃ ভগবানের কাছ হইতেই আসিয়াছে এবং ইহার লক্ষ্যও হইতেছে ভগবানের কাজ করা, জগতে ভগবানের ইচ্ছা সম্পাদনে সহায়তা করা। ভগবান মানুষকে অর্থ দেন যেন মানুষ তাহার সদ্ব্যবহার করে, সকল অর্থকে ভগবানেরই ন্যস্ত ধন মনে করিয়া ভগবানের কাজে লাগায়। কিন্তু অজ্ঞানের বশে মানুষ তাহা করে না, অর্থের অপব্যবহার করে, অহংভাবের বশে ব্যক্তিগত তুচ্ছ ভোগের জন্য অর্থকে ধরিয়া রাখিতে চায়—এই ভাবেই অর্থ অনর্থ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ অর্থে আসক্ত হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া যায়। তুচ্ছ ভোগের আশায় এইভাবে মানুষ আসুরিক শক্তির হস্তে যন্ত্র হইয়া উঠে। যেমন কাঞ্চন, তেমনিই কামিনী—এই দুইটির প্রতি মানুষের অহংয়ের অতি তীব্র আসক্তি, এবং মানুষের অহংয়ের ভিতর দিয়া অসুরও এই দুইটি শক্তিকে, অর্থশক্তি ও যৌনশক্তিকে নিজ কবলে রাখিয়াছে, অসুরের প্রভাবের বশে মানুষ এই দুইটি শক্তির অতিশয় অপব্যবহার করে, নতুবা জ্ঞানের সহিত ঠিকভাবে ব্যবহৃত হইলে এই দুইটি শক্তিই পূর্ণ দিব্য জীবন গঠনে সহায় হয়। অর্থশক্তির উপর অসুরের প্রভাব এমনভাবে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, অর্থের সংশ্রবে

* বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী অই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন।

আসিয়া নিজেকে খাঁটি রাখিতে পারে—এরূপ লোক সংসারে খুব কমই আছে। কামিনী সম্বন্ধেও তাই। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের উপর এত জোর দিয়াছেন।

কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা সকলেই যদি অর্থ বর্জ্জন করেন, তাহা হইলে সংসারের সকল অর্থ অসাধুর হস্তে থাকিবে, আসুরিক শক্তির কবলে থাকিবে, এবং অর্থশক্তির অপব্যবহারের ফলে সংসারে দুঃখ ও অশান্তির সীমা থাকিবে না। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। প্রলুব্ধ ধনীরা লোককে শাসন, শোষণ, উৎপীড়ন করিয়া অধিকাংশ ধনসম্পত্তি নিজেদের কবলে রাখিয়াছে, ফলে এই বসুন্ধরা অসীম ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইলেও অধিকাংশ মনুষ্যকেই অতি দীন দরিদ্রের জীবন যাপন করিতে হইতেছে, ফলে সংসারে দুঃখ ও পাপের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব সাধু ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য হইতেছে আসুরিক ও অশুভ শক্তির কবল হইতে অর্থশক্তিকে উদ্ধার করিয়া ভগবানের কাজে নিয়োগ করা। সন্ন্যাসীদের ন্যায় অর্থকে একেবারে বর্জ্জন করা, কাঞ্চনের সম্মুখে সঙ্কুচিত হওয়া শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে, আবার ব্যক্তিগত ভোগসুখের জন্য কাঞ্চনে আসক্ত হওয়া, অর্থের দাস হইয়া পড়াও ঠিক নহে। টাকাকে নিজের ভোগের উপাদান বলিয়া মনে না করিয়া, ভগবানের জিনিষ বলিয়া মনে করিতে হইবে, ভগবানের জন্য উহা অর্জ্জন করিয়া ভগবানেরই কাজে লাগাইতে হইবে। আমাদের মধ্যে টাকার প্রতি যদি কোন আসক্তি না থাকে তাহা হইলে ভগবানের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আমরা বিশেষভাবে সমর্থ হইব। এই আসক্তিহীনতার লক্ষণ হইতেছে সমতা। টাকা সম্বন্ধে মনে যদি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, উহার ব্যবহারে যদি কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা কৃপণতা আইসে, নিজের জন্য উহা রাখিবার যদি একটুও প্রবৃত্তি থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের আসক্তি এখনও সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নাই, টাকার দোষ হইতে আমরা এখনও মুক্ত হইতে পারি নাই। দারিদ্র্যই মানবজীবনের আদর্শ নহে, ভারতে দারিদ্র্যকে কখনও জাতীয় আদর্শ বলিয়া প্রচার করা হয় নাই, কাঞ্চন, অর্থ, ভারতে লক্ষ্মী বলিয়া পূজিত হইয়াছে, দরিদ্রকে ভারতবাসী লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। বর্ত্তমানে মহাত্মা গান্ধী যে দারিদ্র্যের আদর্শ প্রচার করিতেছেন উহা ঠিক ভারতীয় আদর্শ নহে, উহা হইতেছে খ্রীষ্টান আদর্শ, যদিও পাশ্চাত্য জাতি নামে খ্রীষ্টান হইলেও কার্য্যতঃ জীবনে ঐ আদর্শ গ্রহণ করে নাই। পূর্ণযোগের আদর্শ-সাধক তিনি "যিনি প্রয়োজন হলে দরিদ্রের জীবন যাপন করতে পারেন অথচ কোন অভাবের বোধ তাঁকে স্পর্শ করবে না, তাঁর অন্তরে ভাগবত চেতনার অবাধ লীলাকে ব্যাহত করবে না। আবার ধনীর মত

জীবন যদি তাঁকে যাপন করতে হয়, তা'ও তিনি পারেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও বাসনার কবলিত হবেন না ; অর্থ বা যে দ্রব্য সব তিনি ব্যবহার করেন তাতে আসক্ত হয়ে পড়বেন না, অসংযত ভোগলালসার দাস হবেন না, কিম্বা অর্থ থাকলে যে সকল অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তাতে অবশ, অসহায়ের মত আবদ্ধ হবেন না।"—

(শ্রীঅরবিন্দের The Mother).

ইহাই বস্তুতঃ গীতার আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ভাবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপর জোর দিয়াছেন তাহাতে মনে হইতে পারে যে তিনি এই পূর্ণ আদর্শ প্রচার না করিয়া সন্ন্যাসের আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ সময়ে কি কার্য্যের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রভাবের বশে মানুষ ভগবানকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেছিল, ঐহিক সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগকেই মানব জীবনের পরম কাম্য বলিয়া গণ্য করিতেছিল, আধ্যাত্মিকতাকে লোকে একটা মানসিক ব্যাধি বা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিল—শ্রীরামকৃষ্ণকে এই স্রোত ফিরাইতে হইয়াছে, তাই ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকেই তাঁহাকে ঝোঁক দিতে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"সব দেখ্‌ছি কলাইয়ের ডালের খদ্দের। কামিনী-কাঞ্চন ছাড়তে চায় না। লোকে মেয়ে মানুষের রূপে ভুলে যায় ; টাকা, ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে ভুলে যায় ; কিন্তু ঈশ্বরের রূপ দর্শন করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়।"

"কামিনী-কাঞ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া জেঠা বোধ থাকে না ··· বিষয়ীরা মাতাল হয়ে আছে। কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত ; হুঁস নাই।" বিষয়ী লোকের এই নেশা ছাড়াইবার জন্যই তিনি কমিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপর এত জোর দিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসকে তিনি মানব-জীবনের একমাত্র আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া প্রচার করেন নাই। তিনি যেমন অন্যান্য সাধনা করিয়াছিলেন, তেমনই সন্ন্যাসে দীক্ষাও লইয়াছিলেন—এক জীবনে সকল রকম সাধনা করিয়াই তঁহাকে প্রমাণ করিতে হইয়াছিল যে, আধ্যাত্মিকতা বুজ্‌রুকি নহে এবং সকল সাধনা, সকল পথের মধ্যেই সত্য আছে—যত মত তত পথ। সন্ন্যাসও একটা পথ, তবে তিনি নিজে পূর্ণতর আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন "মায়াবাদ শুক্‌নো, আমি নিত্যও চাই, লীলাও চাই।" ইহা ঠিক গীতার শিক্ষা, গীতাও সন্ন্যাসকে একটি পথ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু বলিয়াছে ঐটিই একমাত্র পথও নহে আর শ্রেষ্ঠ সাধনাও নহে (৫।২)। লোকশিক্ষার জন্য যে কতকগুলি লোকের সন্ন্যাসগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করিতেন।

সংসারী মানুষ বিষয়মদে মাতাল হইয়া রহিয়াছে—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে দেখিলে তাহার হুঁস হইতে পারে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন,—যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোট্‌কা গন্ধ! ও গন্ধ থাক্‌লে বৃথা সৌন্দর্য্য। সন্ন্যাসীর ভারি কঠিন নিয়ম। যখন সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে, তখন ঠিক সাধু সন্ন্যাসীর মত কাজ করতে হবে।···কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়।"

"চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন। সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী কঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার নির্লিপ্ত হলেও লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনী-কাঞ্চন রাখবে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদ্‌গুরু!—তাঁকে দেখে তবে ত লোকের চৈতন্য হবে!"

"যাদের দ্বারা তিনি লোকশিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার। তা না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হলে হবেনা। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। তা না হলে লোকে মনে করে, ইনি যদিও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বল্‌ছেন, ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে ঐসব ভোগ করেন। সন্ন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনী-কাঞ্চন লয়ে থাকে,—তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না।"

এখন আমরা বুঝিতে পারি কেন শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপর এত জোর দিয়াছিলেন। ঐটিই মানব জীবনের লক্ষ্য নহে, উহাতেই জীবনের পূর্ণতা নহে—তবে জীবনকে পূর্ণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই ভগবদুপলব্ধি এবং আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠা। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া থাকিলে কখনই তাহা সম্ভব নহে—কিন্তু এই আসক্তি ত্যাগ অতিশয় কঠিন। কতকগুলি লোক যদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগী ও ন্যাসী হইয়া দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে তাহা হইলেই লোকে অধ্যাত্ম জীবনের পথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা পাইবে, সাহস পাইবে—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য। ভগবানকে লাভ করিলে যে সংসারের কোন কিছু ত্যাগেরই প্রয়োজন হয় না, বিদ্যার সংসারে সব কিছু লইয়া থাকা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। তবে সেই বিদ্যার সংসার কার্য্যতঃ কিরূপ হইবে, দিব্যজীবন কি, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে তিনি কিছুই বলেন নাই—তিনি কেবল ঐ জীবনের অধ্যাত্ম ভিত্তিটির উপরেই জোর দিয়াছেন। কামিনী-কাঞ্চন লইয়াও যে বিদ্যার সংসার করা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—এবং সেইটিই মানবজীবনের প্রকৃত আদর্শ। লোকশিক্ষার জন্য কতকগুলি লোককে সন্ন্যাসী হইতে হয়, কিন্তু ঐ ব্যবস্থা সকল মানবের জন্য নহে,

সকলের পক্ষে ঐ ব্যবস্থা উপযোগীও নহে, আর এটি শ্রেষ্ঠ আদর্শও নহে। এমন লোক আছে যাহাদের পক্ষে নির্গুণ, নির্ব্যক্তিক, নিরাকার নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের উপলব্ধিই সহজ ও স্বাভাবিক—তাহাদের জন্যই মায়াবাদ, তাহারাই সন্ন্যাসের প্রকৃত অধিকারী, কিন্তু এই সাধনা খুবই কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে আর বাহিরে গেরুয়া, বড় ভয়ঙ্কর।" আর সন্ন্যাসী হইতে হইলে শুধু কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিলেই হয় না, কর্ম্মও ত্যাগ করিতে হয়। আজকাল দেখা যায়, সন্ন্যাসী হইয়াও অনেকেই জনহিতকর, সমাজ-সেবামূলক নানা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন—ইহা হইতেছে আদর্শ-বিপর্য্যয়। কর্ম্মে আসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি অপেক্ষা কম প্রবল নহে, উহা ঐ একই রজোগুণের ক্রিয়া। অতএব লোককে আসক্তি-ত্যাগ শিখাইতে হইলে, সন্ন্যাসীর পক্ষে সকল-প্রকার কর্ম্মত্যাগ প্রয়োজন। শঙ্কর এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন। কিন্তু এই আদর্শের বিপদ আছে, এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাধারণ মানুষের বুদ্ধিভেদ হইতে পারে, তাহারা তামসিকতায়, আলস্য ও জড়তায় পতিত হইতে পারে, এইভাবে সংসার সমাজ উৎসন্ন যাইতে পারে, সেই জন্যই গীতা পুনঃ পুনঃ ভিতরের ত্যাগের উপরই জোর দিয়াছে, বাহিরে ত্যাগের দৃষ্টান্তকে বিপজ্জনক বলিয়াছে।

কামিনী-কাঞ্চন লইয়াও যে "বিদ্যার সংসার" করা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন :—"মনে ত্যাগ হলেই হলো। তা হলেও সন্ন্যাসী। কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে তো।"

"টাকাতে যদি কেউ 'বিদ্যার সংসার' করে, ঈশ্বরের সেবা, সাধু-ভক্তের সেবা করে, তাতে দোষ নাই। স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা,—তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের মা তিনিই এই মায়ার রূপ,—স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। সব স্ত্রীলোককে ঠিক 'মা' বোধ হলে তবে 'বিদ্যার সংসার' করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।"

স্ত্রীলোককে আনন্দময়ীর এক একটি রূপ বলিয়া দেখা, শ্রীরামকৃষ্ণ এই আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যকে তুচ্ছ বস্তু বা পাপ* বলিয়া মনে করিতেন না—সে-বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিচার ছিল। তবে সাধন অবস্থায়

* খ্রীষ্টানধর্ম্মে নারীর সৌন্দর্য্য পাপ বলিয়া পরিগণিত। শঙ্করাচার্য্য নারীকে বলিয়াছেন, নরকের দ্বার। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এক নারীকে তাঁহার গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, নারী স্বর্গের দ্বার।

স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত না করিবার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছেন—"সাধনের অবস্থায় কামিনী দাবানল স্বরূপ—কাল সাপের স্বরূপ। সিদ্ধ অবস্থায়, ভগবান দর্শনের পর, তবে মা আনন্দময়ী। তবে মার এক একটি রূপ বলে দেখবে।

টাকাকেও তিনি তুচ্ছ বস্তু বা পাপ বলিয়া মনে করিতেন না। টাকার প্রতি আসক্তি যাহাতে দূর হয় সেই জন্য তিনি এক হাতে টাকা অন্য হাতে মাটি লইয়া "টাকা মাটি" "মাটি টাকা" এইরূপ বলিতে বলিতে দুইকেই সমান জ্ঞান করা অভ্যাস করিয়াছিলেন—এবং শেষে টাকা ও মাটি দুই-ই গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই আবার তাঁহার ভাবনা হইল, মা লক্ষ্মীকে জলে ফেলিয়া দিলেন, তিনি যদি রুষ্ট হইয়া অন্ন বন্ধ করিয়া দেন তাহা হইলে কেমন করিয়া জীবন ধারণ হইবে? এই সাধনাটি খুবই শিক্ষাপ্রদ—টাকার প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করিতে হইবে, সমভাব লাভ করিতে হইবে, কিন্তু টাকাকে অবহেলা করা ঠিক নহে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা—"বিদ্যার সংসারের জন্য বেশী অর্থ উপায়ের চেষ্টা করবে। উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য নয়; ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয়, তো সে টাকায় দোষ নাই।" অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা সুস্পষ্ট—"অতিমানস সৃষ্টিতে অর্থশক্তি ভাগবত শক্তির নিকট ফিরাইয়া আনিতে হইবে, জগন্মাতা তাঁহার সৃজনাত্মক দৃষ্টিতে যে-ভাবে নির্দ্দেশ করেন সেই অনুসারে অর্থকে ব্যবহার করিয়া এক নূতন দিব্যভাবে রূপান্তরিত দেহ ও প্রাণের জীবন সুগঠিত করিবার উপযোগী সুন্দর ও সুসমঞ্জস উপচার সকল সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমে দরকার জগন্মাতার জন্য অর্থ জয় করিয়া লইয়া আসা। আর এই জয়ের সামর্থ্য তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে যাহারা তাহাদের প্রকৃতির এই অংশে সরল, উদার অহংভাবশূন্য হইবে, যাহারা নিজেদের জন্য কোন কিছু দাবী না করিয়া, নিজেদের জন্য কিছু না রাখিয়া অকুণ্ঠভাবে নিজদিগকে সমর্পণ করিয়া দিবে, যাহারা পরমাশক্তির শুদ্ধ ও বলবান যন্ত্র হইবে।" (The Mother)

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু। মৃৎপিণ্ড ও কাঞ্চন, শত্রু ও মিত্র, সাধু ও পাপী—এই সবের প্রতি যাঁহার সমান জ্ঞান হইয়াছে তিনিই সিদ্ধযোগী বা যোগারূঢ়, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। শঙ্করের অনুসরণ করিয়া শ্রীধর প্রভৃতি টীকাকারগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যে-ব্যক্তি প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়াই এবং পূর্ব্বস্নেহ বা পূর্ব্বসম্বন্ধ না থাকিলেও উপকার করে তাহাকে সুহৃদ বলা হয়। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভগবান নিজকে সর্ব্বভূতের সুহৃদ বলিয়াছেন। যে স্নেহবশতঃ উপকার করে সে মিত্র। অরি শব্দের অর্থ ঘাতুক বা অপকারক। যে

উপেক্ষা করে সে উদাসীন। দুইজন কলহকারী ব্যক্তির উভয়েরই যে হিতৈষী সে মধ্যস্থ। যাহাকে ভাল লাগে না সে দ্বেষ্য। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে সে বন্ধু। সাধু শব্দে—সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি।

বাংলা ভাষায় সুহৃদ, মিত্র, বন্ধু এসব শব্দ প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং যাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে তাহাদিগকে বিশেষভাবে বন্ধু না বলিয়া কুটুম্ব বলা হয়। কিন্তু এই শব্দগুলির যে অর্থই ধরা হউক, এখানে গীতার বক্তব্য স্পষ্ট। সাধারণতঃ আমরা মানুষকে দেখি আমাদের অহংয়ের সহিত তাহার কিরূপ ব্যবহার সেই বিচার করিয়া—কারণ অজ্ঞানের মধ্যে আমরা যতদিন বাস করি অহংই থাকে আমাদের জীবনের কেন্দ্র। কে আমার শত্রু, কে আমাব মিত্র, কাহাকে আমার ভাল লাগে, কাহাকে ভাল লাগে না—এইরূপ বিচার করিয়াই আমরা মানুষে মানুষে ভেদ করি এবং তাহাদের প্রতি ব্যবহারের তারতম্য করি। ইহাতে পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা, আর বস্তুতঃ সাধারণ জীবনে অন্য মানুষের সহিত আমাদের ব্যবহার ভ্রান্তিতে পূর্ণ এবং তাহার ফলে জীবন দুঃখ, দ্বন্দ্ব ও অশান্তিতে পূর্ণ হয়। কোন্ মানুষের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে—সে-সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে আছে, তাহা সকল সময়েই আমাদিগকে সত্য প্রেরণা দিতেছে, কিন্তু আমাদের বাহিরের মানস চৈতন্যে আমরা অজ্ঞান ও অহংভাবময় বলিয়া ভিতরেব সেই নির্দ্দেশ শুনিতে পাই না, শুনিলেও তাহার মর্ম্ম ঠিক মত বুঝিতে পারি না, আবার বুঝিলেও অনেক সময়েই তাহা গ্রাহ্য করি না, তাহা অমান্য করিয়া আমাদের প্রাণের বাসনা কামনা রাগদ্বেষ অনুসরণ করিয়া চলি। কিন্তু যোগীপুরুষ এই অজ্ঞান অহংভাব হইতে মুক্ত হন, সর্ব্বত্র এক আত্মাকে দেখেন—তাই সকলের প্রতি তাঁহার সমবুদ্ধি, সমান ভাব,

আত্মৌপম্যেনঃ সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

যিনি সর্ব্বত্র এক আত্মাকে প্রতিভাত দেখিয়া সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী—তিনি অন্তরাত্মার বাণী, হৃদিস্থিত ভগবানের বাণী অভ্রান্ত ভাবে শুনিতে পান এবং তদনুযায়ী মানুষের সহিত ব্যবহার করিতে অগ্রসর হন, অহংয়ের রাগদ্বেষের বশে নহে। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে আসিয়া অহংজ্ঞানে মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তাই যাহারা অধর্ম্ম পক্ষে যুদ্ধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, যাহাদিগকে নিহত, পরাজিত করা অর্জ্জুনের ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ছিল, তাহারা তাঁহার স্বজন বলিয়া তিনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। অতএব যাহাতে আমরা সঙ্গীন

মুহূর্তে এইরূপ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হই সেজন্য সর্ব্বদা সমতা অভ্যাস করা প্রয়োজন। মিত্র বলিয়া কাহারও প্রতি স্নেহে অন্ধ হইতে নাই, শত্রু বলিয়াও কাহারও প্রতি দ্বেষে অন্ধ হইতে নাই—সমতার সহিত, জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া ক্ষেত্র অনুসারে কর্ম্মের বিধান করিতে হয়। এই সমতা পূর্ণ হয় যখন আমরা অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করি, আত্মাকে জানি, ভগবানকে জানি, সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতের মধ্যে যে এক ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সাক্ষাৎ পাই। আলিপুর বোমার মামলার সময়ে কারাগারে শ্রীঅরবিন্দ এই গভীর দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন—তাই তিনি শত্রু পক্ষের মধ্যেও বাসুদেবকে দেখিয়া সকল ভয় ও দুর্ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"আমার সেলের সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে।" দার্শনিক পণ্ডিত ব্যক্তি শত্রু, মিত্র, উদাসীন, নিরপেক্ষ সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন কারণ তিনি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া দেখেন যে এই সব সম্বন্ধ সাময়িক, আজ যে শত্রু, কাল সে মিত্র হয়, অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে এ-সব সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন হয়। ইহা সাত্ত্বিক সমতা। ইহারও উপরে হইতেছে যোগীজন-সুলভ আধ্যাত্মিক সমতা, তাহা আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে এক আত্মাকে ও ভগবানকে দেখিয়া এই সমভাব লাভ করা যায়।

সাধুষ্বপি চ পাপেষু। সাধারণ লোকে সাধু ও অসাধুর মধ্যে, পাপী ও পুণ্যবানের মধ্যে যে ভেদ করে, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার দ্বারাও বিভ্রান্ত হন না। তিনি জানেন মানুষ যে নিজেকে ভারি সাধু ও পুণ্যবান মনে করিয়া অন্যকে পাপী বলিয়া নিন্দা করে, ঘৃণা করে, সেটা মিথ্যা আত্ম-গৌরব। মানুষ যতদিন অজ্ঞান অহংভাবের মধ্যে বাস করিতেছে ততদিন কাহারও পক্ষেই সম্পূর্ণ ভাবে শুদ্ধ নিষ্পাপ হওয়া সম্ভব নহে। প্রাচীন ইহুদীগণের মধ্যে প্রথা ছিল যে, কোন স্ত্রীলোক ব্যাভিচারিণী হইলে তাহার উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। এইরূপ একটি অভাগিনী নারীকে জনতা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে যীশুখ্রীষ্ট সেই উন্মত্ত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি কখনও কোন পাপ কর নাই সে-ই প্রথমে এই নারীর উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর।" তখন আর কেহ সে-কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল না, স্ত্রীলোকটিও নিষ্ঠুর মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল।

জগতের সকল বস্তু, সকল ঘটনার পশ্চাতে ভগবানের ইচ্ছা, ভাগবত শক্তি কার্য্য করিতেছে যেমন সাধুর মধ্যে তেমনই অসাধুর মধ্যেও। মানুষ সসীম, খণ্ড—কিন্তু অসীমতার দিকে, অখণ্ডতার দিকে তাহার প্রবৃত্তি রহিয়াছে—তাহার অন্তর্নিহিত

ভাগবত সত্তা তাহাকে সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে দেয় না। এই ভাগবত-প্রেরণাই অজ্ঞানের মধ্যে বাসনা-কামনারূপে দেখা দেয়, মানুষ অপরকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজেকে বড় করিতে যায়, সব কিছুকে নিজের প্রাপ্য বলিয়া ধরিতে যায়, গ্রহণ করিতে যায়, ভোগ করিতে যায়—আর ইহা সে অজ্ঞানের সহিত করে, অহংভাবের বশে নিজেকে অন্য সকল হইতে পৃথক মনে করিয়া করে, পরস্পরের সহিত ঐক্য ও আদান-প্রদানের নীতি অনুসরণ না করিয়া দ্বন্দ্ব, কাড়াকাড়ি, জোর জবরদস্তির নীতি অনুসরণ করে, এইভাবেই অশুভ ও পাপের উদ্ভব হয়। ভগবান ইহা ঘটিতে দেন কারণ এই সব দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই মানুষের চেতনার বিকাশ হয়, যেমন পুণ্যের ভিতর দিয়া তেমনই পাপের ভিতর দিয়াও মানুষ পরিণামে অমৃতত্বের জন্য, দিব্য-জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। তাই দেখা যায় প্রকৃতির ক্রিয়ায় সাধু অসাধু পাপ পুণ্যে ভেদ নাই—কখনও শুভ হইতে অশুভ হইতেছে, কখনও অশুভ হইতে শুভ হইতেছে—এককালে যাহা পাপ বলিয়া গণ্য ছিল তাহাই আবার কখনও পুণ্য বলিয়া গণ্য হইতেছে, তেমনিই পুণ্য পাপ বলিয়া গণ্য হইতেছে—প্রকৃতি যখন যাহাতে সুবিধা পায়, সুযোগ পায় তাহার দ্বারাই নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিয়া চলে, পাপ-পুণ্যের ভেদ করিয়া নিজ চরম লক্ষ্য হইতে সে কখনও ভ্রষ্ট হয় না। তাই আমরা দেখিতে পাই ভগবান যুদ্ধের ন্যায় পরম অশুভ ও পাপও ঘটিতে দেন। মানুষকে তাহার পুরাতন সংস্কার ও বন্ধনসকল হইতে মুক্ত করিবার জন্য, নূতন সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ও হত্যালীলা ভগবানের বিধানেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক সংঘটিত হয়।

প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্য দেখিয়া তাই মনে হয় যে, জগতে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সাধু অসাধুর বিচার নাই—প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্যের জন্য উভয়কেই সমানভাবে কাজে লাগায়। তথাপি ঐ প্রকৃতিই আবার মানুষের মধ্যে পাপ-পুণ্যের বোধ দিয়াছে, পাপকে বর্জ্জন করিবার, পুণ্যকে গ্রহণ করিবার যে প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে রহিয়াছে, যাহার দ্বারা মানুষের জীবন অনেক সময়েই সংশয়াকুল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে তাহা হইতেছে তাহার সহজাত স্বাভাবিক প্রেরণা। এই পাপ-পুণ্য বোধেরও প্রয়োজনীয়তা আছে, সার্থকতা আছে—প্রকৃতি মানুষকে ক্রমবিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যে দিব্য গতির দিকে লইয়া চলিয়াছে, এই পাপ-পুণ্য বোধের দ্বারা তাহাতে সহায়তা হয়, অতএব ইহা অপরিহার্য্য—মানুষকে তাহার গন্তব্য পথে অনেক জিনিষ বর্জ্জন করিতে হইবে, অনেক জিনিষ গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবে সে একদিন সকল সাময়িক শুভ অশুভ পাপ-পুণ্যের ঊর্দ্ধে এক শাশ্বত ও অনন্ত শুভের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

মানুষকে পাপ-পুণ্য ভেদে সাহায্য করিবার জন্য দেশে দেশে যুগে যুগে নানা

ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই সব বিধিনিষেধ আংশিক মানসিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ-সবের দ্বারা উপসর্গেরই চিকিৎসা করা হয়, মূল রোগের প্রতিকার হয় না। অশুভ প্রবৃত্তিসকল কেন প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, আমাদের প্রাণ ও মনে কোন্ জিনিষ তাহাদিগকে সমর্থন করিতেছে, বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—সে-সবের পূর্ণ জ্ঞান না থাকায় ঐ গতানুগতিক বিধিনিষেধের দ্বারা স্থায়ী কোন রূপান্তর সাধিত হয় না। আমাদের দেহ ও প্রাণের প্রবৃত্তি ও কামনাসকলের উপর একটা মানসিক সংযম, বুদ্ধিগত সংযম প্রয়োজন, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এই সংযমের যে আদর্শ দেয় তাহা দ্বারা আমরা নিজদিগকে চালিত, নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। এইভাবে আমরা সাধু ও সদাচারী হই, কিন্তু ইহা কখনই সম্পূর্ণ হয় না, ইহা পূর্ণ সমাধান নহে। এ-সব সত্ত্বেও মানুষ চিরকাল যেমন ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্যের মিশ্রণ ছিল, এখনও তেমনই রহিয়া গিয়াছে —সেই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি কোন্ মানুষ সাধু এবং কোন্ মানুষ অসাধু বা পাপী এইরূপ লৌকিক ভেদের দ্বারা বিভ্রান্ত হন না। মানুষ এখন যে ত্রিগুণময়ী নিম্ন প্রকৃতিতে বাস করিতেছে, ইহাতে সে বিচার বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া সাত্ত্বিক চরিত্রে গঠিত হইতে পারে, সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণার ভাব, সকল ব্যবহারে ও কর্ম্মে সুসামঞ্জস্য ও সুব্যবস্থা, শান্ত, সংযত, সুরুচিসম্পন্ন জীবন—ইহার অধিক আর কিছুই সম্ভব নহে। প্রকৃত সমাধান তখনই আসিতে পারে যখন আমর আত্ম-জ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিকাশের দ্বারা সর্ব্বভূতের সহিত আত্মায় নিজেদের একত্ব অনুভব করি, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা, সকলকে আমাদেরই সত্তার অংশ বলিয়া মনে করি, অপরের সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করি যেন তাহারা আমারই অন্য রূপ, আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি।

সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সাধু অর্থাৎ যাঁহারা শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী, আর পাপী অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করে। এইরূপ সাধু ও পাপীর প্রতি সমভাবাপন্ন হইতে হইবে এরূপ অর্থ শঙ্কর গ্রহণ করিতে পারেন না। তাই তিনি "সমবুদ্ধি" শব্দের এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কঃ কিং কর্ম্মেত্যব্যাপৃতবুদ্ধিরিত্যর্থ অর্থাৎ "কে কি কর্ম্ম করিতেছে তাহা ভাবিয়া যিনি নিজ বুদ্ধিকে ব্যাপৃত করেন না।" শ্রীধর প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এই কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীধর বলিয়াছেন, সমা রাগদ্বেষাদি শূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্ট। সর্ব্ববিধ প্রাণীকেই রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত চিত্তে যিনি সমান জ্ঞান করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। মধ্বাচার্য্য আরও গভীর ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

পাপ পুণ্য ইত্যাদি প্রভেদ রহিয়াছে প্রকৃতিতে; জীবাত্মা চৈতন্যময়, তাহাকে এই সব দোষ স্পর্শ করে না, কি সাধু, কি পাপী সকলেরই অন্তরাত্মা শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। আর প্রকৃতির বশে মানুষ যে পাপ ও পুণ্য আচরণ করে তাহারও পিছনে ঈশ্বরেরই শক্তি কার্য্য করিতেছে, (১৮।৬১)। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে,

স্বতঃ সর্ব্বেপি চিদ্রূপাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ।
জীবাস্তেষাং তু যে দোষাস্ত উপাধিকৃতা মতাঃ॥

সর্ব্ব চেশ্চরতস্তেষাং ন কিঞ্চিৎ স্বত এব তু।
সমা এবং হ্যতঃ সর্ব্বে বৈষম্যং ভ্রান্তিসম্ভবম্॥

জ্ঞানী ব্যক্তি সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন, ইহার অর্থ নহে যে সকলের প্রতিই তিনি সমান ব্যবহার করেন। হৃদয়ে সকলের প্রতি সমভাব, মৈত্রী ও করুণার ভাব থাকিবে, কিন্তু কাহার প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে তাহা অজ্ঞান অহংভাবের বশে নির্দ্ধারণ না করিয়া সাক্ষাৎ ভগবদ্ প্রেরণা অনুসরণে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে—ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগীর আদর্শ।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০

অন্বয়। যোগী সততং রহসি স্থিতঃ একাকী যতচিতাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ (সন্) আত্মানং যুঞ্জীত।

অনুবাদ। যোগী নির্জ্জন স্থানে একাকী অবস্থিত হইয়া সমগ্র সত্তা ও চৈতন্যকে সংযত করিয়া, সকল বাসনা ও পরিগ্রহ বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা আত্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিবেন।

ব্যাখ্যা

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং। দেহ, প্রাণ ও মনের উর্দ্ধে আমাদের মধ্যে যে অক্ষর আত্মা রহিয়াছে, যাহা চির শান্ত ও নির্ব্বিকার, প্রকৃতির কোন দ্বন্দ্ব, কোন বিক্ষোভ যাহাকে এতটুকু বিচলিত করিতে পারে না—তাহার সহিত যুক্ত হইবার সাধনা করিয়া যিনি তাহারই ন্যায় কূটস্থ নির্ব্বিকার হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত সিদ্ধ যোগী, তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, সংসারের সকল বস্তু, সকল ঘটনা, সকল মানুষের প্রতি তাহার সমভাব। এইরূপ যোগ সাধনা সহজ নহে, এই যোগের বর্ণনা শুনিয়া অর্জ্জুন পরেই যেমন বলিয়াছিলেন, চঞ্চল মনের পক্ষে এই উচ্চ অবস্থা হইতে পতিত হইবার সম্ভাবনা সকল সময়েই রহিয়াছে,

বাহ্য বস্তুর আকর্ষণে যোগভ্রষ্ট হইয়া সাধক আবার শোক দুঃখ, কাম ক্রোধের বেগে ভাসিয়া যায়, সমতা হারাইয়া ফেলে*। নিখিলে যত সুন্দরী যুবতী রমণী আছে তাহাদের প্রতীক স্বরূপ উর্ব্বশীকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন,

'মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় আনি পদে তপস্যার ফল।'

ইন্দ্রিয়জয়ী না হইলে যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না, কিন্তু এ-বিষয়ে সাধক যত অগ্রসর হয়, ততই অন্যদিক হইতে তাহার উপর আক্রমণও প্রবল হয়; ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু হইতে দূরে থাকিলে হয়ত নিরাপদ থাকা যায়, কিন্তু তীব্র সুখপ্রদ ভোগসুখের বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে বেগ উপস্থিত হয় তাহাতে কত সাধকের বহু যত্নে অর্জ্জিত সাধনার ফল যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই মন ও তাহার ক্রিয়াসকলকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিবার জন্য গীতা নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনার সহিত রাজযোগেরও উপদেশ দিয়াছে। ইহাই গীতার প্রণালী। গীতার যোগ রাজযোগ নহে, জ্ঞানের সহিত সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া কর্ম্মযোগের সাধনা করিবার কথাই গীতা এতক্ষণ বলিয়াছে এবং এইটিই গীতার নিজস্ব শিক্ষা। তবে গীতা অন্য কোন সাধনাকেই অবহেলা করে নাই, আত্মজয়ের কঠিন সাধনায় যে পন্থা হইতে যতটুকু সাহায্য পাওয়া যায় তাহা লইতে গীতার কোন বাধা নাই—সকলেই যে এক বাঁধাধরা পথে একই ভাবে অধ্যাত্ম সাধনা করিবে ইহা গীতার মত নহে।

এই কথাগুলি বলা আবশ্যক হইল কারণ অনেকেই গীতার এমন ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, রাজযোগের শিক্ষা দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য, উহাই গীতার যোগ, গীতায় আর যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা অবান্তর। মন সংযমের একটি প্রণালীরূপে রাজযোগ যে খুবই শক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে বস্তুতঃ পক্ষে গীতার শিক্ষায় উহা হইতেছে অবান্তর। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ই গীতার নিজস্ব যোগ—উহারই একটি শক্তিশালী সহায়রূপে গীতা রাজযোগের বর্ণনা দিয়াছে। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, রাজযোগ যেমন গণা-গাথা বাঁধাধরা পথে অগ্রসর হয়, যম নিয়মাদি অষ্ট অঙ্গ, আবার যম পাঁচ প্রকার, নিয়ম পাঁচ প্রকার,—গীতা এই ভাবে সাধনা করিবার উপদেশ দেয় নাই। রাজযোগের একটি প্রধান অঙ্গ প্রাণায়াম, ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা রাজযোগ প্রণালীর বিস্তৃত বর্ণনা দিলেও প্রাণায়ামের কোন উল্লেখই করে নাই। বস্তুতঃ রাজযোগের যে-সব শক্তিশালী প্রণালী আছে তাহাদের মধ্য হইতে সাধক যে সাহায্য ও সুবিধা পায় গ্রহণ করিতে পারে, ইহাই গীতার মত বলিয়া মনে হয়।

শঙ্কর এই শ্লোকে যোগী শব্দে ধ্যায়ী অর্থাৎ ধ্যানযোগী বুঝিয়াছেন, রামানুজ বুঝিয়াছেন কর্ম্মযোগী, মধ্ব বুঝিয়াছেন সমাধিযোগী, শ্রীধর বুঝিয়াছেন যোগারূঢ় ব্যক্তি। এখানে গীতা যে যোগ সাধনার কথা বলিয়াছে তাহা ধ্যানযোগ, উহা দ্বারা সমাধির অবস্থা লাভ করা যায় অতএব ইহাকে সমাধিযোগ বলা যায়। বস্তুতঃ ইহা রাজযোগ, কিন্তু গীতা রাজযোগ শব্দ ব্যবহার না করিয়া পরে এই সাধনা-প্রণালী বুঝাইতে ধ্যানযোগ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে (১৮।৫২)। ইহার কারণ মনে হয় এই যে, অষ্টাঙ্গ রাজযোগ শিক্ষা দেওয়া গীতার উদ্দেশ্য নহে, অষ্ট অঙ্গের মধ্যে ধ্যানটির উপরেই গীতা জোর দিয়াছে এবং যাহাতে ধ্যানের সুবিধা হয় সেইরূপ প্রণালীই অবলম্বন করিতে বলিয়াছে। আনন্দগিরি বলিয়াছেন গীতা এই শ্লোকে যোগের পঞ্চ অঙ্গ দেখাইয়াছে, রহসি, একাকী, যতচিত্তাত্মা, নিরাশী, অপরিগ্রহ। এইরূপ হিসাব করিলে এই যোগকে পঞ্চাঙ্গ যোগ বলা যাইতে পারে —কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গীতা এইরূপ গণা গাঁথার পক্ষপাতী নহে। পরে গীতা আসনাদি অন্য অঙ্গেরও উল্লেখ করিয়াছে—অতএব এইরূপ অঙ্গ গণনা করিবার কোনই সার্থকতা নাই—গীতা যে-সাধনার কথা বলিয়াছে তাহার উপরেই দৃষ্টি দিতে হইবে।

আর ধ্যানযোগী, কর্ম্মযোগী, সমাধিযোগী এইরূপ প্রভেদ করাও গীতার উদ্দেশ্য নহে—যে যোগের অভ্যাস করিতেছে তাহার পক্ষে যেমন ধ্যান প্রয়োজন, তেমনই কর্ম্মও প্রয়োজন (৬।১৭)—আবার এই যোগের উৎকর্ষের জন্য ভক্তিও প্রয়োজন (৬।৩১,৪৭), সেই জন্যই গীতা এখানে সাধারণ ভাবে যোগী শব্দ ব্যবহার করিয়াছে —যে-ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতেছে তাহাকেই যোগী বলা হইয়াছে। যেমন নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যোগী যোগাভ্যাসপরো।

যুঞ্জীত আত্মানং, আত্মাকে যোগযুক্ত করিবে। এখানে আত্মা শব্দে কেহ বুঝিয়াছেন মন, কেহ বুঝিয়াছেন বুদ্ধি, শঙ্কর সাধারণভাবে বলিয়াছেন অন্তঃকরণ। মন, বুদ্ধি, হৃদয় সব লইয়াই আত্মার সহিত, ভগবানের সহিত যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। এখন আমাদের হৃদয় মন বুদ্ধি সবই বহির্মুখী, বাহিরের বস্তু-সকল লইয়াই ইহারা ব্যাপৃত, সর্ব্বদা সেই দিকেই ধাবিত—তাহাদিগকে সেদিক হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে, আত্মায় নিবদ্ধ করিতে হইবে। আমাদের দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, হৃদয়ের উর্দ্ধে, তাহাদের ক্রিয়ার অবিচলিত সাক্ষী স্বরূপ আত্মা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাই আমাদের প্রকৃত সত্তা, আমাদের প্রকৃত "আমি", সেই আত্মার ধারণা করিতে হইবে, মনকে তাহাতেই সংলগ্ন রাখা অভ্যাস

করিতে হইবে। সেই আত্মার সন্ধান কেমন করিয়া পাওয়া যায়? আমরা নিজদের অন্তরের মধ্যে সন্ধান করিলেই• আত্মার সন্ধান পাইব। আমরা যখন কোন কিছু চিন্তা করি, বা কাম ক্রোধাদি আবেগের বশীভূত হই, বা সুখ দুঃখ অনুভব করি—তখন আমাদের মধ্যে একটি দ্রষ্টা থাকে, সে দেখে যে আমরা চিন্তা করিতেছি, ক্রুদ্ধ হইতেছি, সুখদুঃখ বোধ করিতেছি—কিন্তু সে দ্রষ্টা এই সব বাহ্য ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র, এ-সবে সে বিক্ষুব্ধ বিচলিত হয় না—সেই দ্রষ্টাই আমাদের আত্মা—পুনঃ পুনঃ সেই আত্মায় মন-বুদ্ধিকে লাগাইয়া যোগ অভ্যাস করিলে আমরা ক্রমশঃ সেই আত্মাই হইয়া উঠিব অর্থাৎ ইহা উপলব্ধি করিব যে ঐ আত্মাই আমাদের প্রকৃত "আমি", আব যাহা কিছু সে-সব বাহ্য, বহিরঙ্গ, অস্থায়ী উপাধি বা আধাব মাত্র।

আত্মায় মন নিবিষ্ট করিতে হইলে, আত্মা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। গুরুমুখে এবং শাস্ত্র হইতে আত্মার স্বরূপ জানিয়া লইতে হয় এবং সর্ব্বদা সেই আত্মায় মনবুদ্ধিকে লাগাইয়া বাখা অভ্যাস করিতে হয়। উপনিষদে বলা হইয়াছে—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ইহাই হইতেছে আত্মলাভের, ব্রহ্মলাভের সাধনা। গীতা প্রথমেই অর্জ্জুনেব শোককে উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছে। আত্মার উপলব্ধি হইলে সকল শোক দুঃখের চির অবসান হয়, সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তেমনই আত্মজ্ঞান হইলে সকল মোহ, সকল শোক চিরদিনের জন্য দূর হয়, তত্র কো মোহ কঃ শোকঃ। আমরা শোক দুঃখে অভিভূত হই কাবণ আমবা নিজদিগকে ক্ষণস্থায়ী জীব বলিয়া মনে করি, সংসাবের অনিত্য বস্তুসকলেব সহিত, স্ত্রী পুত্র গৃহ ধন ইত্যাদির সহিত নিজদিগকে এক করিয়া দেখি—তাই কখন তাহাদিগকে হারাইব সর্ব্বদা আমাদের সেই ভয়, আর কোন প্রিয় বস্তু নষ্ট হইলে আমরা শোকে অভিভূত হইয়া পড়ি। ইহা অজ্ঞান মায়া, কারণ সদ্‌বস্তু কখনও বিনষ্ট হয় না, নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। আমরা ক্ষণস্থায়ী জীব নহি,

দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরায়
দীপ নিভে যায় আঁধারে,
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন
ডেকে ডেকে মরি কাহারে—

এইরূপ আর্ত্তনাদ মোহান্ধ অজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। জ্ঞানী দেখেন যে, তিনি অবিনাশি, নিত্য সনাতন—ধূলা হইতে আমাদের জন্ম,

ধূলাতেই আবার ফিরিয়া যাইব, এ-কথাটা কেবল আমাদের এই বাহ্যরূপটা সম্বন্ধে, দেহটা সম্বন্ধেই খাটে, আত্মা সম্বন্ধে নহে—আমাদের জীবন অনাদি অনন্ত, সেই অনন্ত জীবনে আমরা লীলাবশে কত দেহ গ্রহণ করিয়াছি, কত দেহ বর্জ্জন করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই—এক জন্মের মধ্যেই দেহটাকে অনবরত নূতন করিয়া গড়িতেছি —যখন ইহার কাজ শেষ হইতেছে, মৃত্যুর ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ নূতন দেহ গ্রহণ করিতেছি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রের সহিত আমাদের তুলনা হয়, তাহারা যেমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে, আমরাও তেমনই আত্ম-জ্যোতিতে চির-জ্যোতিষ্মান। চন্দ্র সূর্য্যের তুলনা দিলাম, কারণ সাধারণ লোকে দুঃখ করে—এই শস্যশ্যামলা অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবী থাকিবে, নিয়মিত ভাবে আবহমান কাল ধরিয়া আকাশে সূর্য্য উঠিব, চাঁদ হাসিবে, কেবল আমরাই থাকিব না—

হেসে নাও দুদিন বইত নয়
কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়!

কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের তুলনায় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকলের জীবনই "দু'দিনের"—উহাদের আদি অন্ত আছে, কোটি কোটি বৎসর পরে উহারা নিভিয়া যাইবে, আবার অকল্পনীয় অন্ধকারের মধ্যে হইতে নূতন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের আবির্ভাব হইবে—কিন্তু আমরা শাশ্বত সনাতন, আমাদের আত্মজ্যোতি কোন দিনই নির্ব্বাপিত হইবে না। কবি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

কত চতুরানন মরি মরি যায়ত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোয়ে জনমি পুনঃ তোয়ে মিলায়ত
সাগর লহরী সমানা।

এই আশ্চর্য্যময় অসীম বিশ্বজগৎ—সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় ভগবানের মধ্যে উঠিতেছে আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে, আমরা আমাদের মূল আত্মসত্তায় এই ভগবানের সহিত এক, নিত্য ও সনাতন।

আমরা শুধু নিত্য নহি, আমরাও ভগবানেরই ন্যায় চৈতন্যময়, আনন্দময়, সচ্চিদানন্দ—আমাদের এই চৈতন্য, এই আনন্দ কোন দিনই ক্ষুণ্ণ হয় না, আত্ম-আনন্দকে বিচিত্রভাবে উপভোগ করিবার জন্য আমরা যে বিচিত্র বাহ্যরূপ গ্রহণ করি, উপাধিস্বরূপ দেহ, প্রাণ, মন গ্রহণ করি তাহাতেই সাময়িক ভাবে অজ্ঞান ও সেই সঙ্গে সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব সম্ভব হয়—কিন্তু আমাদের মূল সত্তায় আমরা সকল

জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখের অতীত চির-আনন্দময়। বেদান্তশাস্ত্র হইতে আমরা আত্মার এই স্বরূপ অবগত হই, গুরুর উপদেশ ও অধ্যাত্মপ্রভাবে আমাদের অন্তরে এই আত্মা সম্বন্ধে উপলব্ধি জাগ্রত হয়, নিরন্তর যোগ অভ্যাসের দ্বারা এই আত্ম-জ্ঞানকে দৃঢ় করিয়া লইতে হয়।

অমৃতত্ব (Immortality) মানব-জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গীতা ও উপনিষদে কথিত হইয়াছে। ইহার অর্থ নহে যে, মানুষ অমর নহে, তাহাকে সাধনার দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে হইবে। মানুষ কখনই মরে না, তাহার দেহই মরিয়া যায়, সাধক অসাধক সকল মানুষই মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করিবে, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। কিন্তু মানুষ তাহার এই অমরত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান—তাহার নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সে অবগত নহে, সেই জ্ঞানলাভ করা, আত্মচৈতন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া—অমৃতত্ব লাভ বলিতে ইহাই বুঝায় এবং ইহার জন্যই সর্ব্বদা যোগ অভ্যাস করিতে হয়। সাধারণতঃ আমরা যে নিরন্তর বাহিরের বস্তু লইয়াই অতিমাত্রায় ব্যাপৃত, দেহ, প্রাণ, মনের বাহ্য ক্রিয়ায় নিমগ্ন—এই বহির্মুখীনতাকে সংযত শান্ত করিয়া অন্তর্মুখী হইতে হইবে। ইহার দুইটি পন্থা বা প্রণালী প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে—একটি হইতেছে বুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব বিচার করা, চিন্তা করা, ধ্যান করা, অপরটি হইতেছে চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা, মনকে শান্ত নীরব করা। প্রথমটি জ্ঞানের পন্থা এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে যোগের পন্থা। জ্ঞান আবার দুই প্রকার, সাংখ্য ও বেদান্ত। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটি পৃথক সত্য, ইহাদের সংযোগেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; বেদান্ত মতে প্রকৃতি পুরুষ হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র নহে—প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি। গীতা সাংখ্য ও বেদান্তের এই প্রভেদ স্বীকার করে নাই, পরন্তু সাংখ্যের পুরুষকেই বেদান্তের ব্রহ্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছে। গীতা যেখানে সাংখ্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছে সেখানে প্রচলিত ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকায় ব্যাখ্যাত সাংখ্য বুঝে নাই, পরন্তু উপনিষদে সাংখ্যতত্ত্ব যে-ভাবে প্রচারিত হইয়াছে সেই বৈদান্তিক সাংখ্য বুঝিয়াছে—ইহাই গীতার বেদান্ত এবং গীতা ইহাকেই সাংখ্য নামে অভিহিত করিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতা বেদান্তের আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াই বলিয়াছে, এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ (২।৩৯)। ইহাই গীতা-কথিত জ্ঞানযোগ। ইহার সহিত প্রভেদ করিয়া গীতা বলিল, যোগে বুদ্ধি যেরূপ, এইবার তোমাকে তাহাই বলিব, যোগে ত্বিমাং শৃণু। ইহা বলিয়া গীতা যোগের যে ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হইয়াছে—গীতার ভাষায় তাহাই হইতেছে কর্ম্মযোগ। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেও গীতা এই প্রভেদ করিয়াছে, 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্ম-

যোগেন যোগিনাম্।' পরে গীতা এই দুই যোগের সমন্বয় করিতে অগ্রসর হইয়াছে। গীতার শিক্ষা বুঝিতে হইলে এই কথাগুলি মনে রাখা একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু গীতা-প্রচারের পূর্ব্বে "যোগ" শব্দ আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইত। এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত "যোগ" শব্দের এক সংজ্ঞা পাওয়া যায় পতঞ্জলির যোগসূত্রে, যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ (১।২), চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। বৃত্তি-নিরোধ বলিতে বুঝায়—কোন অভীষ্ট বিষয়ে মনকে স্থির রাখা, অতএব অভ্যাস দ্বারা যথেচ্ছ যে-কোন বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাখিতে পারার নাম যোগ। এই যোগ অভ্যাসের দ্বারা মানসিক বল বৃদ্ধি পায়, যে-কোন বিষয় সূক্ষ্মভাবে, গভীর ভাবে অবগত হওয়া ও আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। তাই মোক্ষধর্ম্মে আছে,

নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং
নাস্তি যোগসমং বলং।

চিত্তস্থৈর্য্যের চরম সীমার নাম সমাধি অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে এমন ভাবে নিবিষ্ট হওয়া যাহাতে ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, ধ্যাতা ও ধ্যেয় এক হইয়া যায়, কবির ভাষায় সমাধির বর্ণনা—

কবে তোমাতে হয়ে রব আমার "আমি"-হারা।

এই যে আত্মার সহিত, ভগবানের সহিত এক হইয়া যাওয়া, ইহাই সমাধি, ইহা ভিন্ন প্রকৃত আত্মজ্ঞান, ভগবদ্জ্ঞান লাভ হয় না—অতএব সকল সাধনাকেই সমাধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইয়াছে। পতঞ্জলির রাজযোগের চরম পরিণতি সমাধি। উপনিষদেও আত্মজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ সমাধির উল্লেখ করা হইয়াছে, "শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া তাহাতে আত্মাকে দর্শন করিবে" (বৃহদারণ্যক ৪।৪)। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনস্বরূপ শমদমাদি অনুষ্ঠেয় বলা হইয়াছে (৩।৪।২৭) এবং এই জাতীয় শ্রুতির আদেশ অনুসারে বেদান্তী শঙ্করাচার্য্যও শমদমাদি সম্পত্তিকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সাধন বিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এইরূপ সমাহিততার জন্য রাজযোগবর্ণিত অষ্টাঙ্গ সাধনপ্রণালী অবলম্বন করা অপরিহার্য্য কি না। আসন প্রাণায়ামাদি অভ্যাস না করিয়াও চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করা যায়—শ্রুতিবাক্যের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন হইতেছে সেই পন্থা। এই ভাবে জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ—দুই প্রকার পন্থায় প্রভেদ হইয়াছে—দুইয়েরই লক্ষ্য এক, সমাধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ ও মোক্ষ, তথাপি আরম্ভ ও প্রণালী লইয়া প্রভেদ হইয়াছে। প্রকৃতি অনুসারে কোন কোন সাধক প্রথম হইতেই নিত্য অনিত্য বিচার করিয়া নিত্যবস্তু আত্মার ধ্যান অভ্যাস করেন,

তাঁহারাই জ্ঞাননিষ্ঠ বা জ্ঞানযোগী। আর যাঁহারা কোন বস্তু বা তথ্যে চিত্তস্থৈর্য্য অভ্যাস করিয়া পরে আত্মতত্ত্বে উপনীত হন তাঁহারাই যোগনিষ্ঠ বা যোগী। জ্ঞাননিষ্ঠগণ আত্মার ধারণা ও ধ্যান করিতে কবিতে ক্রমশঃ ভিতব হইতে বাহ্যকরণেও স্থৈর্য্য লাভ করেন। যোগনিষ্ঠগণ বাহ্যকবণেব স্থৈয্য অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানে উপস্থিত হন। কেহ কেহ প্রথমটিকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলেন। কল্পতরুকার অমলানন্দ বলেন, "বেদান্তবেদ্য বস্তুর ভাবনা হইতে যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহার মূল নিরতিশয় দৃঢ় বলিয়া উহা কখনও ভ্রমাস্পদ হয় না।" রাজযোগ প্রণালীতে সমাধির সময়ে যে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, সমাধি ভঙ্গ হইলে সে জ্ঞান নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বেদান্ত-বাক্য হইতে যে জ্ঞান হয় তাহা স্থায়ী। অন্যপক্ষে স্মৃতিকার দক্ষ বলেন, "জন্মান্ধ যেমন ঘটপটাদি পদার্থের চাক্ষুষজ্ঞান পায় না, কুমারী যেমন স্ত্রীসুখ বুঝিতে পারে না, অযোগীও সেইরূপ স্বসংবেদ্য ব্রহ্মের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না।"

যাহাই হউক "যোগ" শব্দে যদি চিত্তস্থৈর্য্যেব অভ্যাস বুঝায় তাহা হইলে মানসিক বল বৃদ্ধির উপায় ও সাধন রূপে সকল সাধনাকেই উহা স্বীকার করিতে হয়, এবং কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে—যোগ হইতেছে practical psychology, কার্য্যকরী মনোবিজ্ঞান, এবং ভারতেব সকল ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনায় বিভিন্ন ভাবে যোগপ্রণালী গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ পতঞ্জলি যে যোগ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা একেবারে নূতন কিছুই নহে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।" যোগ চিরবর্ত্তমান, সেইজন্য হিরণ্যগর্ভও উহার অনুস্মারক ও বক্তা। বৌদ্ধগণ রাজযোগের ন্যায়ই যোগপ্রণালীর বিকাশ করিয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"ককারাদি বর্ণের অভ্যাস যেমন শাস্ত্রবোধ উৎপাদন করে, যোগও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করাইয়া থাকে" (স্বচ্ছন্দঃ-শাস্ত্র)। বেদান্ত দর্শনে বলা হইয়াছে —এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩)—অর্থাৎ ইহার দ্বারা যোগ খণ্ডিত হইল; ইহার দ্বারা পাতঞ্জল যোগসূত্রের দার্শনিক ভাগই খণ্ডিত হইয়াছে, উহা সাংখ্যেরই অনুরূপ—কিন্তু ইহার দ্বারা চিত্তসংযমরূপ যোগপ্রণালী খণ্ডিত হয় নাই। একটি অবলম্বন ব্যতীত চিত্তসংযম দুর্ঘট বলিয়াই যোগশাস্ত্র সাংখ্য দর্শনের অধ্যাত্ম-বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে, পরন্তু বেদান্ত দর্শনের অধ্যাত্মবিদ্যা অনুসরণ করিলেও রাজযোগ অনুযায়ী চিত্ত-সংযম অভ্যাস করা যায়। যদি কেহ সাংখ্য দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব ত্যাগ করিয়া বেদান্তবেদ্য অদ্বয় আত্মা বা ব্রহ্মকে অবলম্বন করে তাহা হইলেও যোগপ্রণালী অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যোগীরাও বলিয়াছেন, ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)। ইহাই বেদান্তের অনুমত যোগ বা

সমাধি। বেদান্ত দর্শন কখনও যোগের খণ্ডন করিতে পারে না, কারণ উহা শ্রুতিমূলক। যোগ সম্বন্ধে শ্রুতিসমূহের উদাহরণ যথা,

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্—শ্বেতাশ্বতর ২।৮

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্—কঠ ২।৬।১১

বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্—কঠ ৬।১৮

তবে রাজযোগের অষ্ট অঙ্গই যে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে। মৈত্রী উপনিষদে বলা হইয়াছে, ষড়ঙ্গা ইত্যুচ্যতে যোগঃ। রাজযোগেও যমনিয়মাদি সমগ্র অষ্ট অঙ্গের সাধন সকলের পক্ষে আবশ্যকীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই, অধিকারী ভেদে সাধন ভেদও স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ যাঁহাদের অভ্যাস ও বৈরাগ্য স্বতঃ উদিত হয় তাঁহারা উত্তম অধিকারী, তাঁহাদিগকে সিদ্ধিলাভের জন্য আর অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। যাঁহারা তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা যোগসিদ্ধ হন, তাঁহারা মৃদু সংবেগশালী মধ্যম অধিকারী; আর যাঁহারা যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ অনুশীলন করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করেন তাঁহারা মন্দ সংবেগশালী সাধারণ অধিকারী। তবে সকলেই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ রাজযোগের সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

ব্রহ্মসূত্র শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ত্ব ধ্যান করাকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনা বলিয়াছে। "এষ মে আত্মা"—পরম পুরুষ ব্রহ্ম আমার আত্মা এইরূপ বুদ্ধিতে স্থিত হইতে হইবে, এবং শিষ্যদিগকেও "এষ তে আত্মা"—ব্রহ্মই তোমার আত্মা এইরূপ ধ্যান করিতে উপদেশ দিতে হইবে, আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ (ব্রঃ সূঃ ৪।১।৩)। রাজযোগ যে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিবার ব্যবস্থা দিয়াছে, ব্রহ্মসূত্র তাহাই গ্রহণ করিয়াছে, অন্য অঙ্গের উল্লেখ করে নাই—আসীনঃ সম্ভবাৎ, ধ্যানাচ্চ (ব্রঃ সূঃ ৪।১।৭,৮)। তবে ব্রহ্মসূত্র যজ্ঞাদি কর্ম্মকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বহিরঙ্গ সাধন বলিয়াছে এবং শমদমাদি সম্পত্তিকে অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়াছে—ইহাই ব্রহ্মসূত্রোক্ত জ্ঞানযোগ। শঙ্করাচার্য্য এই জ্ঞানযোগেরই বহুল প্রচার করিয়াছেন। এ-বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের সহিত গীতার প্রভেদ প্রণিধান-যোগ্য। গীতা রাজযোগের শুধু আসন ও ধ্যানই গ্রহণ করে নাই পরন্তু প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতিও গ্রহণ করিয়াছে। গীতা রাজযোগোক্ত যম ও নিয়মের উপর জোর দেয় নাই, বাহ্য বিধিনিষেধ পালনের উপর গীতার তেমন আস্থা নাই, তবে গীতা সাধারণ ভাবে বলিয়াছে যে যোগ-সাধনা করিতে হইলে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ ও সংযত করিতে হইবে, যতচিত্তাত্মা। গীতার রাজযোগ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত

হইয়াছে, ইহা প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে পতঞ্জলির যোগের সহিত এক না হইলেও মূলতঃ ঐ একই প্রণালী। তবে গীতা যোগ বলিতে পতঞ্জলির ন্যায় শুধু এই রাজযোগই বুঝে নাই—রাজযোগকে গীতা যোগের একটি শক্তিশালী সহায়রূপেই গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ তাহার বাহ্য-চৈতন্যে ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতেছে, ভগবান যে তাহার অন্তরের মধ্যে অন্তর্যামী হইয়া রহিয়াছেন, তাহাকে পরিচালিত করিতেছেন, সে যে প্রকৃতিতে সেই ভগবানের অংশ এবং মূল সত্তায় তাঁহার সহিত এক, এই সত্য সে জানে না, উপলব্ধি করে না এবং এই বিচ্ছেদ ও অজ্ঞানই হইতেছে তাহার যত দুঃখ, অশান্তি ও অপূর্ণতার মূল। এই বিচ্ছেদ দূর করিতে হইবে, মানুষের সহিত ভগবানের সাক্ষাৎ সজ্ঞান সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—গীতা "যোগ" বলিতে মূলতঃ ইহাই বুঝিয়াছে, যদিও এই যোগেব লক্ষণ ও ফল অনুযায়ী নানা স্থানে ইহাকে নানা ভাবে বর্ণনা করিয়াছে, যথা, সমতাই যোগ, দুঃখের সহিত চিরবিচ্ছেদই যোগ ইত্যাদি। গীতা এই যে সংযোগ অর্থে "যোগ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছে ইহা হইতেছে উহার ধাতুগত অর্থ—যুজ্ ধাতুর অর্থ হইতেছে সংযুক্ত করা। অন্যান্য শাস্ত্রেও "যোগ" শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"সংযোগো যোগো ইত্যুক্তো জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ।" জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনের দ্বারাই ভগবানের উপাসনা করিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্ত হওয়া যায় এবং এইরূপ বিভিন্ন উপাসনাকে গীতা জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ নামে অভিহিত করিয়াছে—গীতার পূর্ব্বে এই সব কথা তেমন প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু এই সকলপ্রকার যোগেই চিত্তের একাগ্রতা সাধন প্রয়োজন এবং তাহার জন্য রাজযোগের অভ্যাস বিশেষ সাহায্যস্বরূপ হয় বলিয়া গীতা তাহা গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহাকে ধ্যানযোগ নামে অভিহিত করিয়াছে। গীতার পূর্ব্বে জ্ঞানের দ্বারা উপাসনা এবং কর্ম্মের দ্বারা উপাসনা "নিষ্ঠা" নামে অভিহিত হইত, "লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা"—গীতা এইগুলিকে "যোগ" নামে অভিহিত করিয়াছে।

গীতা "যোগ" শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থে কর্ম্মযোগই বুঝিয়াছে, কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। কিন্তু পাতঞ্জল যোগসূত্রে কর্ম্মকে একটি স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বা যোগ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই—কর্ম্মকে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের একটি প্রাথমিক সহায় রূপেই গণ্য করা হইয়াছে। পাতঞ্জল মতে কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ—কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, শুক্ল এবং অশুক্লাকৃষ্ণ। পাপীদের কর্ম্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্ম কৃষ্ণ। সাধারণের কর্ম্ম, গৃহস্থের কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ, তাহারা পাপও করে, পুণ্যও করে। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে জীবহত্যা, পরপীড়ন ইত্যাদি অপরিহার্য্য। সেই সঙ্গে তাহারা দানাদি নানা পুণ্যকর্ম্মও করে। যাহারা

কেবল তপঃ স্বাধ্যায় ও ধ্যান করে, তাহাদের কর্ম্ম মানসিক, বাহ্যোপকরণনিরপেক্ষ, তাহাতে পরকে পীড়া দেওয়া হয় না; তাহাই বিশুদ্ধ শুক্ল বা পুণ্যময়। আর সন্ন্যাসীদের কর্ম্ম হইতেছে অশুক্ল ও অকৃষ্ণ, তাঁহারা ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন তাই তাহা অশুক্ল, এবং তাঁহারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম, পাপ কর্ম্ম বর্জ্জন করেন বলিয়া তাহা অকৃষ্ণ।

পাপ ও পুণ্য উভয় প্রকার কর্ম্মই ফল প্রদান করিয়া বন্ধনের কারণ হয়, অতএব যোগীদের পক্ষে উভয়ই বর্জ্জনীয়। তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই কর্ম্মগুলি যদি ফলকামনাশূন্য হইয়া কেবল চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্য করা হয় তাহা হইলে তাহারা অবিদ্যাদি ক্লেশকে ক্ষীণ করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ করে এবং নিরোধের সহায় হয়, তাই এই কর্ম্মগুলি পাতঞ্জলসূত্রে ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। অতএব পাতঞ্জলের মতে বৈদিক যজ্ঞকর্ম্ম মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের সহায় নহে। ব্রহ্মসূত্রও কর্ম্মকে জ্ঞানলাভের গৌণ উপায় বলিয়াছে—উহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সহায় হয়, তবে ব্রহ্মসূত্র পাতঞ্জলের ন্যায় যজ্ঞকর্ম্মকে অবহেলা করে নাই। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন"—ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যজ্ঞ, দান তপস্যা ও অনাসক্তি দ্বারা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন—এইরূপ শ্রুতিবাক্যের নির্দ্দেশ করিয়া ব্রহ্মসূত্র দেখাইয়াছে যে যজ্ঞও জ্ঞান লাভের সহায় হয় (৩।৪।২৭), যদিও সাক্ষাৎভাবে নহে, গৌণ ভাবে। ব্রহ্মসূত্রের মতে যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতেছে জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন এবং শম দম তিতিক্ষা উপরতি ও সমাধি হইতেছে অন্তরঙ্গ সাধন। তবে ব্রহ্মসূত্র ইহাও বলিয়াছে যে, মুক্তি লাভের জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম অপরিহার্য্য নহে। "অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা" (৩।৪।২৫)—বিদ্যাই মুক্তি লাভের একমাত্র হেতু বলিয়া মুক্তিলাভ অগ্নি, কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা সাধ্য যজ্ঞাদি আশ্রম-বিহিত কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ব্যতীতও কেবল বিদ্যাপ্রভাবেই মুক্তিলাভ ঘটে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জল ও ব্রহ্মসূত্র উভয়ের মতেই কর্ম্ম হইতেছে গৌণ, বিদ্যা বা জ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র হেতু। তবে পাতঞ্জল যেমন যজ্ঞাদি আশ্রমবিহিত কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়াছে, ব্রহ্মসূত্র তাহা করে নাই—ব্রহ্মসূত্র চারি আশ্রমেরই উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে এবং যদিও কোন আশ্রমে না থাকিয়া এবং আশ্রমবিহিত কর্ম্ম না করিয়াও সিদ্ধিলাভ করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায় (৩।৪।৩৬-৩৭) তথাপি ব্রহ্মসূত্রের মতে অনাশ্রমী ভাব হইতে আশ্রমী ভাবই শ্রেষ্ঠ (৩।৪।৩৯)। গীতা আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছে যে, মোক্ষলাভের উপায় রূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই সমান পর্য্যায়,

কোনটিই মুখ্য বা গৌণ নহে—বস্তুতঃ গীতা নিষ্কাম কর্ম্মকে জ্ঞানেরই অঙ্গরূপে গ্রহণ করায় কার্য্যতঃ গীতায় জ্ঞান ও কর্ম্মে কোন বিরোধই নাই। ব্রহ্মসূত্র শ্রুতিবাক্য অনুসরণ করিয়া এইরূপ বিরোধ দেখাইয়াছে, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুণ্ডক ২।২), আরও বলিয়াছে যে ঊর্দ্ধরেতঃ (সন্ন্যাস) আশ্রমে বিদ্যাসাধনেরই উপদেশ উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মের নহে (৩।৪।১৬-১৭)। ইহার উত্তরে গীতা বলিয়াছে যে, সকাম কর্ম্মের সহিতই বিদ্যা বা জ্ঞানের বিরোধ, নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত নহে। আর গীতা সন্ন্যাস আশ্রমের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে নাই (৬।১) এবং এ-বিষয়ে জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসার সহিত গীতার মতের মিল রহিয়াছে। অবশ্য ব্রহ্মসূত্রেও বলিয়াছে, জ্ঞানের সহিত যে কর্ম্ম করা যায় তাহা বন্ধন সৃষ্টি করে না (৩।৪।১৪), তথাপি ব্রহ্মসূত্রের মতে গার্হস্থ্য আশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাস আশ্রমও অবশ্য অনুষ্ঠেয় (৩।৪।১৯)। এইখানে ব্রহ্মসূত্রের সহিতও গীতার প্রভেদ হইয়াছে। গীতা বলিয়াছে যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম কখনই ত্যাজ্য নহে, আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহাই গীতার নিশ্চিত মত, এ-বিষয়ে গীতা কোন সন্দেহের স্থান রাখে নাই (১৮।৪-১১)। আর যজ্ঞ দান ও তপস্যা বলিতে গীতা সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্মই বুঝিয়াছে, সর্ব্বকর্ম্মাণি—এইটিই হইতেছে বেদান্ত ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র হিসাবে গীতার বৈশিষ্ট্য। পরে যোগবাশিষ্ঠ এ-বিষয়ে গীতারই মত সুস্পষ্ট ভাবে অনুসরণ করিয়াছে—মহাকর্ত্তা মহাভোক্তা মহাত্যাগী ভবানঘ (৬।১১৫।১)।

কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইলে, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে হইলে জ্ঞান প্রয়োজন, আত্মসংযম প্রয়োজন, ইন্দ্রিয়জয় প্রয়োজন—এবং ইহার জন্য রাজযোগের ধ্যান পদ্ধতি বিশেষ সহায় বলিয়া গীতা তাহার উপদেশ দিয়াছে। পাতঞ্জল কর্ম্মকে ধ্যান ও সমাধির একটি গৌণ সহায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, গীতা ধ্যান ও সমাধিকে কর্ম্মযোগের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, গীতার যে কর্ম্মযোগ তাহা একই সঙ্গে জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজযোগের বর্ণনা প্রসঙ্গেই গীতা তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছে (৬।২৯-৩২)। ব্রহ্মসূত্রে জ্ঞানযোগই মুক্তি লাভের পন্থা (৩।৪।১), কর্ম্ম ও ভক্তি সেখানে গৌণ—কিন্তু গীতায় এই তিনের কোনটিকেই নিম্নস্থান দেওয়া হয় নাই, পরন্তু গভীর ও উদার অধ্যাত্ম সত্যের ভিত্তিতে তিনেরই সমন্বয় করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও গীতার শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নহে, উত্তম রহস্য নহে। তৎকালে প্রচলিত সকল প্রকার সাধনারই উপযোগিতা গীতা স্বীকার করিয়াছে (৪।৩১—৩৩) এবং বলিয়াছে যে,

তাহাদের সকলেরই মূল হইতেছে কর্ম্ম, কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্। গীতা তাহাদের একটি সমন্বয় করিয়াছে, তাহাই গীতার যোগ, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-মূলক। কিন্তু এইটিই গীতার শেষ কথা নহে—গীতার শেষ কথা হইতেছে এই যে, মানুষ যদি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিতে পারে তাহা হইলে আর তাহার কোন সাধনারই প্রয়োজন হয় না—ভগবানের কৃপা-শক্তিই তাহাকে সকল সিদ্ধি আনিয়া দেয়। কিন্তু এই পরম গুহ্য কথাটি গীতা সর্ব্বশেষে বলিয়াছে। কারণ অন্যান্য সাধনার দ্বারা দেহ, প্রাণ, মন কতকটা প্রস্তুত হইলে মানুষের পক্ষে এইরূপ সমগ্রভাবে ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করায় অনেকটা সহায়তা হইতে পারে। এই ভাবেই গীতা এখানে রাজযোগের নির্দ্দেশ দিয়াছে।

গীতা বলিয়াছে সর্ব্বদা এই যোগ সাধনা করিতে হইবে, সততং। ইহার অর্থ নহে যে যাবজ্জীবন রাজযোগের অভ্যাস করিতে হইবে। যতদিন না অধ্যাত্ম চেতনায় প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয় ততদিন নিয়মিত ভাবে ধ্যান করা কর্ত্তব্য, ইহাই গীতার মত। পাতঞ্জল সূত্রে বলা হইয়াছে, "অভ্যাস দীর্ঘকাল, নিরন্তর ও অত্যন্ত আদরের সহিত আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয়" (১।১৪)। নিরন্তর অর্থাৎ প্রাত্যহিক ; রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সততমহরহঃযোগকালে। প্রত্যহ কতক্ষণ ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে তাহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম দেওয়া যায় না ; অন্য সকল কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া শুধুই ধ্যান করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে, এবং সাধারণতঃ এরূপ চেষ্টা অতিশয় কষ্টকর এবং তাহাতে ধ্যানও ভাল হয় না। তাই গীতা বলিয়াছে যাহারা পরিমিত নিয়মিত ভাবে আহার বিহার ও কর্ম্ম করে এবং যথোচিত সময় নিদ্রা যায় তাহাদের পক্ষেই যোগ সুগম হয়। তবে যত বেশীক্ষণ ভাল ভাবে ধ্যান করিতে পারা যায় ততই চিত্ত-স্থৈর্য্যলাভে অগ্রসর হওয়া যায়।

রহসি স্থিতঃ। নির্জ্জনস্থানে একাকী যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"একান্তে পর্ব্বতগুহাদিতে অবস্থিত ও 'একাকী' অসহায় হইয়া ; একান্তে স্থিত ও একাকী এই দুইটি বিশেষণ থাকাতে 'সন্ন্যাস করিয়া' এই প্রকার অর্থই পাওয়া যাইতেছে।" পাতঞ্জল দর্শনেও রাজযোগের যেরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উহা সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব, গৃহস্থের পক্ষে নহে। অষ্টাঙ্গ রাজযোগের প্রথম অঙ্গ যম পাঁচ প্রকার—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ। সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তিই এই সকল যথাসাধ্য আচরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু যোগীদের পক্ষে এই সব আচরণ সার্ব্বভৌম মহাব্রত হওয়া চাই অর্থাৎ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হওয়া চাই (২।৩২)। গৃহস্থের পক্ষে

এই মহাব্রত সম্ভব নহে, কেবল সন্ন্যাসীরাই এই সব পরিপূর্ণরূপে আচরণ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গীতা এইরূপ সন্ন্যাসের পক্ষপাতী নহে, অতএব গীতা যে রাজযোগের নির্দ্দেশ দিয়াছে তাহা সর্ব্ববিষয়ে পাতঞ্জল দর্শনের অনুযায়ী নহে। ব্রহ্মসূত্র সন্ন্যাস সমর্থন করিলেও এমন কথা বলে নাই যে, সন্ন্যাস না করিলে ধ্যানযোগ অভ্যাস করা যায় না বা জ্ঞানলাভ করা যায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের উপসংহারে বলা হইয়াছে—"সমাবর্ত্তন করিয়া পবিত্র গৃহস্থাশ্রমে পবিত্র স্থানে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপ বিধানানুসারে যাপন করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তথা হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হন না।" এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মসূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, গৃহস্থের পক্ষে যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম যেমন কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসাশ্রম-বিহিত বিদ্যোপাসনাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য ; এই বিদ্যাবলেই পুনরাবর্ত্তনের নিবৃত্তি হয় (৩।৪।৪৮)।

কিন্তু গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াই যদি ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তিলাভ করা যায় তাহা হইলে সন্ন্যাস আশ্রমের আবশ্যকতা কি ? এ-সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে কোন যুক্তি প্রদর্শন করা হয় নাই, কেবল শ্রুতির প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জৈমিনি দেখাইয়াছেন যে, বেদে কোথাও সন্ন্যাস আশ্রমের বিধান নাই, বরং "নাপুত্রস্য লোকোঽস্তি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাই করা হইয়াছে। বাদরায়ণের যুক্তি এই যে, গার্হস্থ্য আশ্রম ও সন্ন্যাস আশ্রম উভয় সম্বন্ধেই শ্রুতিবাক্য তুল্য, অতএব উভয় আশ্রমই অনুষ্ঠেয়। "আমাদের পক্ষে এক আত্মাই এতৎ সমস্ত লোক, সুতরাং পুত্রাদি লইয়া কি করিব ?" (বৃহদারণ্যক ৪।৪) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছায় গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ত্যাগের উল্লেখ দেখাইয়া (৩।৪।৫) বাদরায়ণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিদ্বান ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারেন ; গ্রহণ করিলে তদ্বিহিত কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাতে তিনি কোনো প্রকারে লিপ্ত হন না। গীতাও বলিয়াছে যে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ের দ্বারাই শ্রেয় লাভ করা যায়, তবে গীতার সুস্পষ্ট মত এই যে, সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা উভয়েই শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে, তবে ব্রহ্মসূত্র সন্ন্যাস আশ্রমের উপর যেরূপ জোর দিয়াছে, গীতা তাহা দেয় নাই—গীতা কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপনিষদের কোন কোন অংশের শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা যে উত্তরোত্তর সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিতেছিল, ব্রহ্মসূত্রে যাহার নিদর্শন পাওয়া যায়, গীতা সেই প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

গীতার পরে ভারতে যে যুগ আসিয়াছিল তাহাতে ভারতবাসী সন্ন্যাসকে খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিলেও গার্হস্থ্য জীবনের উপরে, সকল প্রকারে জীবনকে ভোগ করার উপরে, বিকশিত করিবার উপরে জোর দিয়াছিল—এবং ইহার সুন্দর নিদর্শন আমরা পাই কালিদাসের কাব্যে। জীবনে যে আনন্দ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, ভোগ আছে, কালিদাস তাহারই কবি, তিনি প্রেমের, সৌন্দর্য্যের, ইন্দ্রিয়ভোগের কবি এবং এ-বিষয়ে তিনি তাঁহার যুগের যোগ্য প্রতিনিধি, "a true son of his age."

কালিদাসের যুগে লোকে জীবনের সৌন্দর্য্য ও আনন্দ কিরূপ উপভোগ করিত তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা এখানে তাঁহার ঋতুসংহার কাব্যের প্রথম কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে লোকে তাপ-শান্তির জন্য কত কি করিতেছে, কবি তাঁহার প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া তাহাই বর্ণনা করিতেছেন—

নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ ক্বচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং শুচৌ প্রিয়ে! যান্তি জনস্য সেব্যতাম্॥
সুবাসিতং হর্ম্ম্যতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রি-গীতং মদনস্য দীপনং শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ॥
নিতম্ববিম্বৈঃ সদুকূলমেখলৈঃ স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ।
শিরোরুহৈঃ স্নানকষায়-বাসিতৈঃ স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়ন্তি কামিনাম্॥ ১।২-৪

"প্রিয়ে! তিমির-হীন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী, বিচিত্র জলযন্ত্রযুক্ত গৃহ, নানাবিধ মণি এবং সরস্ চন্দন এই গ্রীষ্মকালে সাধারণের প্রিয় হইয়া থাকে।

রাত্রিতে পুরুষগণ মনোহর-সুগন্ধযুক্ত অট্টালিকায় সুখাসীন হইয়া প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস-বিকম্পিত মধু এবং কামোদ্দীপক তানলয়াদিসঙ্গত বীণার সুমধুর সঙ্গীত উপভোগ করিয়া থাকে।

রমণীগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বসন ও মেখলায় শোভিত নিতম্ব, সচন্দন হারমণ্ডিত স্তন ও মনোমুগ্ধকর গন্ধদ্রব্যানুবাসিত কেশ-কলাপ দ্বারা প্রিয়জনের গ্রীষ্মসন্তাপ নিবারণ করে।"

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য মূল্য ৸৹

শ্রীঅরবিন্দের The Yoga and its Objects হইতে অনূদিত। "অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় যোগতত্ত্বের বিজ্ঞান সম্মত দার্শনিক ব্যাখ্যায় আমরা চমৎকৃত। বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।"

—দৈনিক বসুমতী

সাধন সূত্র মূল্য ৶৹

"সাধক ও কর্মীজীবনের অবশ্যজ্ঞাতব্য ও পালনীয় বিষয়গুলির শ্রীঅরবিন্দ কৃত আধ্যাত্মিক বিচার অসাধারণ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ভাস্বর।"

—দৈনিক বসুমতী

The Message of the Gita: -As interpreted by Sri Aurobindo. Rs. 10-0-0

With text, translation and notes compiled from Sri Aurobindo's Essays on the Gita. Published by Allen & Unwin, London

"These notes are illuminating They interpret the text in a manner which is not obvious on the surface."

— *The Times, Literary Supplement, London.*

"An ideal book both for study and for reference."

— *The Science of Thought, England.*

Mother India Re. 1-0-0

"A great nation which has had that vision can never again be placed under the feet of the conqueror."

— *Sri Aurobindo.*

"I have read the book several times and am profoundly impressed. Your purpose was to awaken the slumbering soul of India ..in that you have eminently succeeded."

Dr R. C. Mazumdar, Vice-chancellor, Dacca.

The Bengal Famine and its Lessons As. [illegible]

"It will even be a greater tragedy than the famine itself if the true causes are not clearly perceived and radical steps are not taken to remedy them."